তুরস্কের মুসলিম খিলাফতের বিপর্যয়ে ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া

এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
এম. ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৯১
সেশন : ১৯৯৮-৯৯
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস বিভাগ
চন্দ্রকোনা কলেজ, নকলা, শেরপুর।

নভেম্বর, ২০০৬ ইং

GIFT

403779
Dhaka University Library
403779

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ডঃ এ. বি. এম. মাহমুদ
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গীকৃত –

আমার পরম পূজনীয় শ্রদ্ধেয় বাবা মরহুম আনছার আলী

ও

পরম পূজনীয় শ্রদ্ধেয় মা জনাব রেজিয়া খাতুন কে ।

403779

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে মোঃ রফিকুল ইসলাম-এর **তুরস্কের মুসলিম খিলাফতের বিপর্যয়ে ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া** শীর্ষক এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রীর আবশ্যকীয় শর্তাবলী পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। আমি এ গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধান করেছি এবং গবেষককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম. ফিল ডিগ্রী প্রধানের জন্য বিবেচনা করার সুপারিশ করছি।

এ. বি. এম. মাহমুদ

ডঃ এ. বি. এম. মাহমুদ
অধ্যাপক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

403779

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **তুরস্কের মুসলিম খিলাফতের বিপর্যয়ে ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া** শিরোনামের এই গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ইতঃপূর্বে কোথাও প্রকাশ বা উপস্থাপন করি নি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
এম. ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৯১
সেশন : ১৯৯৮-৯৯
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস বিভাগ
চন্দ্রকোনা কলেজ, নকলা, শেরপুর।

নভেম্বর, ২০০৬ ইং

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"তুরস্কের মুসলিম খিলাফতের বিপর্যয়ে ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে পেরে আমি পরম করুণাময় মহান আল্লাহ এর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এ অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমি যাঁর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ এবং আমার ঋণ অপরিশোধ্য তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ এ. বি. এম. মাহমুদ। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপদেশ এবং মূল্যবান সময় অকৃপন হস্তে দান করার ফলে আমার গবেষণা কর্মের অগ্রগতিকে পরিপূর্ণ রূপদান করেছে। এর সাথেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ মোঃ মোফাখখারুল ইসলাম এবং সাবেক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ রতন লাল চক্রবর্ত্তী -এর প্রতি যিনি আমার এম. ফিল প্রথম পর্বের একজন কোর্স শিক্ষক হিসেবে আমাকে গবেষণা সংক্রান্ত মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন।

এ গবেষণা কর্ম প্রণয়ন কালে আমি কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তিত্বের মূল্যবান পরামর্শ, উপদেশ এবং গবেষণা কর্মে সহযোগিতা লাভ করি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের প্রাক্তন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (বর্তমানে উপ-সচিব), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক ডঃ গোলাম রব্বানী, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বাবু অসিত চন্দ্র দেব ও আমার কর্ম প্রতিষ্ঠান চন্দ্রকোনা কলেজ, নকলা, শেরপুর এর অধ্যক্ষ জনাব মোঃ এনামুল হক। আমি তাঁদের নিকট ঋণী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গণ গ্রন্থাগার, চন্দ্রকোনা কলেজ, নকলা, শেরপুর গ্রন্থাগার ও গবেষণা বিভাগ ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে বাধিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণা কর্মে আরও যাঁরা নানাভাবে অকৃপন হস্তে সহযোগিতা করেছেন, যাঁদের ঋণ স্বীকার না করলে অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হতে হবে, তাঁরা হলেন, আমার বন্ধুবর ডঃ মোহাম্মদ খায়রুল আহসান ছিদ্দিকী, চন্দ্রকোনা কলেজের আমার সহকর্মী পৌরনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আলীমুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক জনাব মোহাম্মদ রৌশন আলম, জনাব এ. বি. এম. মুছা ভাই, আমার ছোট ভাই জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম টুটুল, আমার স্নেহস্পদ জনাব মোহাম্মদ ওমর ফারুক, স্নেহস্পদ আমেরিন বিনতে রহিম সুহানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সহকারী জনাব ছিদ্দিক ভাই, ইতিহাস বিভাগের অফিস এ্যাসিটেন্ট জনাব মাসুদ ভাই ও আমার সহধর্মীনি জনাব সালমা ইসলাম।

আমি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমার পরম পূজনীয় শ্রদ্ধেয় বাবা মরহুম আনছার আলী-এর স্মৃতির প্রতি যিনি এ গবেষণা কর্ম চলাকালের কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাৎ কামনা করি।

পরিশেষে, আমি সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম পূজনীয় শ্রদ্ধেয় মা জনাব রেজিয়া খাতুনের প্রতি– যাঁর নিকট আজন্ম ঋণবদ্ধ রয়েছি।

মোঃ রফিকুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

এ গবেষণা কর্মটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধত্তোরকালে ভারতের রাষ্ট্রীয় গুরু ব্রিটিশ ও তার মিত্র শক্তি কর্তৃক তুরস্কের মুসলিম খিলাফতের বিপর্যয়ে ভারত তথা বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ব্যাপকতা তুলে ধরার একটি বিনীত প্রয়াস। এ গবেষণা কর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ব্রিটিশ ও তার মিত্র শক্তি কর্তৃক তুরস্কের মুসলিম খিলাফতের বিপর্যয়ে ভারতের সুন্নী মুসলমানরা তুর্কী খিলাফতকে তাঁদের ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রাণ কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে হিন্দুদের সম্পৃক্ত করে ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশবিরোধী এক ঐতিহাসিক খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। তা-ই উপস্থাপন করা।

প্রথম অধ্যায়ে খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে মুসলিম খিলাফত পর্যায়ক্রমে তুরস্কে স্থানান্তর এবং তুর্কী সুলতানগণ খিলাফতের মাধ্যমে বিশ্বের সুন্নী মুসলমানদের উপর ধর্মীয়ভাবে নেতৃত্বের আস্থা অর্জন করে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলে। কিন্তু বিশ্বরাজনীতির টানাফোড়নে তাদের উত্থান-পতনও ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় যুদ্ধত্তোরকালে ব্রিটিশ ও তার মিত্রশক্তি কর্তৃক তুরস্কের তথা খিলাফতের বিপর্যয় ঘটে। ফলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সুন্নী মুসলমানদের ন্যায় ভারতের সুন্নী মুসলমানরাও তুর্কী খিলাফতকে ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। তা-ই আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের রাষ্ট্রীয় গুরু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, যুদ্ধ শেষে তুরস্কের খিলাফতের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে। এ প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে মুসলমানরা তাঁদের ধর্মীয় গুরু তুরস্কের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রীয় গুরু ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পরাজিত তুরস্ককে ব্রিটিশ ও তার মিত্রদের মধ্যে ভাগভাটোয়ারা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় তুরস্কের মুসলিম খিলাফতের বিপর্যয় শুরু হয়। আর এ বিপর্যয়ে সারা ভারতের মুসলমানরা উদারপন্থী হিন্দুদের সম্পৃক্ত করে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফত ও অসহযোগ

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন, সে সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সমগ্র বাংলার খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে তুরস্কের খিলাফতের বিপর্যয়ে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহারে গবেষণা কর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সার এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের গুরুত্ব এবং এর প্রভাবে পরবর্তীতে ভারত তথা বাংলার রাজনীতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় সঞ্চিত সংগ্রামী চেতনাবোধ পরবর্তীতে ভারত, পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
উৎসর্গ	I
প্রত্যয়ন পত্র	II
ঘোষণা পত্র	III
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	IV - V
সার-সংক্ষেপ	VI - VII
সূচিপত্র	VIII
অধ্যায় ১: **মুসলমানদের ধর্মীয় গুরুত্ব হিসেবে তুরস্কের খিলাফত**	১ - ১৯
অধ্যায় ২: **তুরস্ক খিলাফতের বিপর্যয়ে ভারতের প্রতিক্রিয়া**	২০ - ৭৮
অধ্যায় ৩: **একনজরে বাংলার প্রতিক্রিয়া**	৭৯ - ১০৪
অধ্যায় ৪: **বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রতিক্রিয়া**	১০৫ - ১৪০
অধ্যায় ৫: **উপসংহার**	১৪১ - ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মুসলমানদের ধর্মীয় গুরুত্ব হিসেবে তুরস্কের খিলাফত

খিলাফত একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। হযরত মুহাম্মদ (সা:) জীবদ্দশায় ধর্মীয় ও পার্থিব কার্যাবলীর প্রধান ছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রধান ইমাম, রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং প্রধান সেনাপতির পদে অলংকৃত ছিলেন। তাঁর ওফাতের পর উক্ত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের খলিফা বলা হত এবং রাজনৈতিকভাবে খলিফার প্রশাসনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বলা হত খিলাফত। প্রথম চার খলিফা জনগণের মতামতের মাধ্যমে অর্থাৎ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এরপর উমাইয়াগণ নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তে "মূলক" অর্থাৎ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।[১] আব্বাসীয়গণও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন।[২] হালাকুখান কর্তৃক বাগদাদ দখলের ফলে আব্বাসীয় খিলাফতের পতন ঘটলে এ বংশের জনৈক রাজপুত মিশরে মামলুক মুসলমানদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৩] মামলুক সুলতানগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সালতানাত প্রতিষ্ঠানের পাশে খিলাফত প্রতিষ্ঠানের আড়াই শতাব্দী টিকে থাকার নিশ্চয়তা বিধান করেন।[৪]

তুরস্কের উসমানীয় সুলতান উয়াভূজ সেলিম মিশর জয় করে মামলুক বংশের অবসান ঘটিয়ে সালতানাত প্রতিষ্ঠানের বাইরে খিলাফত প্রতিষ্ঠান আলাদাভাবে দেখতে অনিচ্ছুক হওয়ায় ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে অবস্থানরত খলিফা মুতওয়াক্কিল বিল্লাহর নিকট হতে খিলাফত গ্রহণ করেন। এভাবে খিলাফত উসমানীয়দের হাতে চলে যায়।[৫]

উসমানের প্রত্যক্ষ বংশধর ছত্রিশজন সুলতান ১৩০০ থেকে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।[৬] উসমানের নাম অনুসারেই এই বংশের নামকরণ করা হয় অটোমান।[৭] অটোমান সুলতান সেলিমসহ অটোমান সুলতানগণ খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। এরপর হতে এভাবে উসমানীয় সুলতানদের দুটো মর্যাদা ছিল – একটি সাম্রাজ্যের প্রজাদের শাসক এবং অপরটি মুসলিম বিশ্বের ইমাম। অটোমান সাম্রাজ্য ধর্মীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুলতানগণ খিলাফতকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। এতে প্রাথমিক পর্যায়ে খিলাফতের কোন অনিষ্ট হয়নি। কিন্তু উলামা সম্প্রদায় ইসলামকে ইচ্ছামত ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

করতে থাকে। এ কারণে খিলাফত প্রতিষ্ঠান প্রকৃত অর্থ হারিয়ে ধর্ম ও রাষ্ট্রের জন্য একটি পশ্চাৎমূখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[৮]

সুলতান প্রথম সুলেমানের রাজত্বকালে (১৫২০-১৫৬৬) অটোমান সাম্রাজ্য তার শক্তির চরমশীর্ষে আরোহণ করে।[৯] সেই সময় অটোমানদের কর্তৃত্ব দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী বুদাপেষ্ট থেকে টাইগ্রীস নদীর তীরবর্তী বাগদাদ পর্যন্ত এবং ক্রিমিয়া থেকে নীল নদের উর্ধ্বাতির সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আধুনিক যুগে এটিই ছিল মুসলমানদের সবচাইতে বৃহৎ সাম্রাজ্য এবং আর কোন মুসলিম সাম্রাজ্য এর মত দীর্ঘস্থায়ী ও বিস্তৃত হয়নি।[১০] যদিও সুলেমানের মৃত্যুর পর অটোমান সাম্রাজ্যের অবনতি শুরু হয়[১১] এবং ইউরোপের দিকে তুরস্কের আধিপত্যের আর কোন অগ্রগতি হয়নি। বরং এই সময় থেকেই তুরস্কের প্রধান সমস্যা হল, যা সে অধিকার করেছে তা রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অর্থাৎ আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পরিবর্তে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে তার সবসময় ব্যস্ত থাকতে হত। আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি বিদেশী শক্তি তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিতে শুরু করলে অটোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার উপক্রম হয়। ফলে তুরস্ক "Sick man of Europe" আখ্যা লাভ করে এবং ইউরোপের প্রতিটি শক্তিশালী দেশই তুরস্কের কোন না কোন অঞ্চলকে নিজের প্রভাবাধীনে আনয়ন করতে সচেষ্ট হয়।[১২] তবে ইউরোপের দেশগুলোর পারস্পারিক ঈর্ষার ফলে একযোগে তাদের পক্ষে কোন নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব না হওয়ায় দুর্বল তুরস্ক তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার সুযোগ পায়।[১৩]

তুরস্ক সাম্রাজ্যের উত্থান এবং পতন এর মূলে ছিল একটি রাজবংশের অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে এই সাম্রাজ্যের পত্তন, যেখানে আনুগত্য প্রদর্শিত হত একব্যক্তি বা কয়েকব্যক্তি অথবা একটি পরিবারের প্রতি। সুতরাং একমাত্র সুলতানের দক্ষতা ও বিচক্ষণতার উপর সরকারের সাফল্য বা ব্যর্থতা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করত।[১৪] যদিও ব্যক্তি বা পারিবারিক শাসন তথাপি একদিকে রাজতন্ত্র এবং অপরদিকে শরিয়ত ভিত্তিক রাষ্ট্রের সংমিশ্রণে ইসলামিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।[১৫] অটোমান সাম্রাজ্যও ইসলামের সকল প্রকার রাজনৈতিক ঘটনার সমন্বয় করেই উদ্ভব হয়। তাই অটোমান সুলতানগণ কেবলমাত্র রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, তাঁরা ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারেও নেতৃত্বের দাবী শুরু করেন। এ সাম্রাজ্যের প্রথম থেকেই ধর্মীয় বন্ধনের আনুগত্য বৃত্তিভিত্তিক বন্ধনের দ্বারা আরও দৃঢ়তা লাভ করে। অপর দিকে খ্রীষ্টান জগতের বিরুদ্ধে অটোমানদের সংগ্রামে উলামাদের প্রতি অনুগত ব্যক্তিগণ ছাড়াও মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু স্বেচ্ছাসেবক তুরস্কে এসে উপস্থিত হয় এবং ধীরে ধীরে তুরস্কের সামরিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। আর সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলিম শাসকদের মধ্যে সুলতান সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশকের পূর্বে তাকে "খলিফা" বলে দাবী করার কোন চেষ্টা করা হয়নি, তথাপি মুসলিমগণ তুরস্কের সুলতানের প্রতি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেনি।[১৬] কারণ মুসলমানগণ পূর্ব থেকেই খলিফাকে আধ্যাত্মিক ধর্মীয় নেতা বলে বিশ্বাস করত এবং খিলাফতকে পবিত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করত। তাই বাগদাদের এবং পরবর্তীতে মিশরের খলিফার নিকট থেকে ভারতে মুসলিম সালতানাতের কোন কোন সুলতান মুসলিম শাসক হিসেবে বৈধতার জন্য সনদ সংগ্রহ করেছিলেন। যেমন ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ইলতুৎমিশ বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার রাজকীয় সনদ (Investitute) এবং সম্মানিত পোষক (Robes of honour) প্রাপ্ত হন।[১৭] মুসলমানদের ধারণা ছিল যে, খলিফার অনুমতিসূচক সনদ (Diploma of investiture) ব্যতীত কেউই আইনসম্মত মুসলিম শাসনকর্তা হতে পারেন না। সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ খলিফার সম্মতিসূচক সনদপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি ভারতের মুসলিম রাজ্যের আইনসম্মত রাজা হলেন এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে তিনি উচ্চস্থানের অধিকারী হলেন।[১৮] সুলতান বিন তুঘলকের সময় রাজ্যের রক্ষণশীল মুসলমান ধর্মনেতারা বিন-তুঘলকের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে এবং তাঁরা সুলতানকে অত্যাচারী আখ্যা দিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ বলে মত প্রকাশ করেন। সুলতান এর প্রতিকারার্থে মিশরের খলিফার নিকট হতে রাজকীয় স্বীকৃতি আনয়ন করেন।[১৯]

মুসলমানদের এই দুর্বলতার সুযোগে তুরস্কের স্বৈরাচারী দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়েও খলিফা পদের অধিকারী হিসেবে তিনি সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার উপর বিশেষ অধিকার প্রয়োগের চেষ্টা করেন।[২০] কিন্তু আরবের জাতিসমূহ সম্পূর্ণ আলাদা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকৃতিগতভাবে তারা ছিল স্বাধীনতা প্রিয়। তাছাড়া আরব জাতীয়তাবাদ এবং

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানের বিরোধী শক্তি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করে। সুতরাং আব্দুল হামিদ আরবজাতির সদিচ্ছা ও সমর্থন লাভ করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেন। সেজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে সুলতান আরবদের সুপরিকল্পিত উপায়ে উদারতা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করতে শুরু করেন। তিনি আরবদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতা ও প্রধান ব্যক্তিদের নতুন নতুন সম্মানে ভূষিত করতে শুরু করেন। আরবদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তিনি মক্কা, মদিনা এবং জেরুজালেমের মসজিদ সমূহের সংস্কারসাধন ও অলংকরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুলতান তাঁর দেহরক্ষীরূপে আরবের একদল বিশ্বস্ত সৈন্যকে নিযুক্ত করেন। তাছাড়া আবরজাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য তিনি আরবের লোকদের গুপ্তচররূপে নিয়োগ করার পদ্ধতি গ্রহণ করেন।[২১] গুপ্তচরগণ তাঁর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।[২২]

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ শাসক হিসেবে "সুলতান" ও "খলিফা" এ দু'পদের সমস্ত ক্ষমতাই ভোগ করতেন।[২৩] তাঁর পূর্বসূরীদের আমলে খলিফার পদ রাজনৈতিক গুরুত্ব একেবারে হারিয়ে ফেললেও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে খিলাফতের মর্যাদা মুসলমানদের নিকট অক্ষুন্ন ছিল।[২৪] কিন্তু তুরস্কের আব্দুল হামিদ খিলাফতকে শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবেই নয়, খিলাফতকে রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন করার চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তুরস্কের সুলতানের পদের সঙ্গে খলিফার পদ অভিন্ন বলে ঘোষণা দেন এবং তাঁর ধারণা ছিল এই ঘোষণার দ্বারা তিনি জনসাধারণের কাছে তুরস্কের শাসকের সম্মান ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। তাঁর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি জামাল উদ্-দিন-আল-আফগানি কর্তৃক প্রচারিত ইসলামের পুনরুদ্ধারের আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। আব্দুল হামিদের এই প্রচেষ্টার ফলে খলিফা পদের অধিকারী হিসেবে তুরস্কের সুলতান সাধারণ মুসলমানদের চোখে খুবই সম্মানের পাত্রে পরিণত হন।[২৫]

খিলাফত সংস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সুলতান আব্দুল হামিদ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তুরস্কের গুরুত্ব বৃদ্ধি করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। তাঁর ধারণা ছিল যে, খলিফারূপে তিনি ব্রিটিশ, ফরাসী এবং রাশিয়া সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের কাছ থেকে শ্রদ্ধার চেয়েও আরও বেশী কিছু লাভ

Dhaka University Institutional Repository

করতে সমর্থ হবেন। তিনি কেবলমাত্র নামে[২৬] নয় কাজেও ইসলাম জগতের প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার চেষ্টা করেন।[২৭] তাই ধার্মিক ও শাস্ত্রবিদ ব্যক্তিদের তিনি তাঁর দরবারে স্থান দেন। ধর্ম শাস্ত্র গঠন ও পঠনের জন্য তিনি উদার হস্তে অর্থ ব্যয় করতে শুরু করেন। এবং বহু মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মস্থান সংস্কার করেন। হেজাজ রেলপথ নির্মান করে তিনি মক্কা ও মদিনার তীর্থযাত্রা সহজ করে তোলেন। খলিফা হিসেবে তাঁর এই একনিষ্ঠ ও সংযমী ভূমিকা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অনতিবিলম্বে অনুভূত হয়। জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম তিনশ মিলিয়ন মুসলিম ধর্মালম্বীদের শ্রদ্ধার পাত্র তুরস্কের সুলতানের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা ঘোষণা করেন।[২৮]

সে সুবাদে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের নিকটও তুরস্কের সুলতান শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেন। এ অঞ্চলের মুসলমানদের অধিকাংশই ছিল সুন্নী মুসলমান।[২৯]

তাঁরা মনে করতেন, খিলাফত হচ্ছে আধ্যাত্মিক ভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং তুর্কী সুলতান এর প্রধান হিসেবে তাঁদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা এবং মুসলমানদের বিশ্বাস রক্ষার্থে তাঁর অস্তিত্ব অটুট থাকতে হবে, যাতে করে জাজিরাতুল আরব, আরব সমূহ রক্ষা করবে মুসলিম ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অন্তিম নির্দেশনা মোতাবেক মুসলমানদের পবিত্র স্থান মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম, সিরিয়া, নাজাফ, কারবালা, সামারা, বাগদাদ, শুধু মুসলমানদের হাতেই থাকবেনা বরং এটি একটি খিলাফতের অধীনে থাকবে যার প্রধান থাকবেন একজন খলিফা।[৩০] তাই তুরস্কের সুলতান মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে তিনি ছিলেন ইসলামের পবিত্র স্থান সমূহের (মক্কা, মদিনা ও জেরুজালেম) তত্ত্বাবধায়ক[৩১] এবং সুন্নী মুসলমানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা।[৩২] এজন্য ভারতীয় সুন্নী মুসলমান তুরস্কের খলিফাকে তাঁদের ধর্মগুরু বলে মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন, কতকগুলো বিশেষ অধিকার তুর্কী সুলতানের অবশ্যই থাকতে হবে। সেগুলো হল:-

১. মুসলমানদের ধর্মীয়ক্ষেত্র তথা পবিত্রস্থান বিশিষ্ট দেশগুলো সুলতানের শাসনাধীন থাকবে।

২. তুরস্ক খলিফার পার্থিব ক্ষমতা তথা রাজ্যধিকার এমন হতে হবে, যাতে তিনি স্বাধীনভাবে ঐ ধর্মক্ষেত্র গুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আরবদেশ মুসলিম দুনিয়ার সর্বপ্রথম ধর্ম ক্ষেত্র বলে তা অবশ্যই তুরস্কের শাসনাধীন থাকবে।[৩৩]

তুরস্কের সুলতানের প্রতি ভারতের মুসলমানদের এরূপ ধারণা[৩৪] এবং ইতিমধ্যে জামাল উদ্দিন আফগানীর ভারত আগমনের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী চেতনার উন্মেষ ঘটায়।[৩৫] উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তুর্কী শাসনের প্রতি যে হুমকী প্রদান করা হয়, তাতে ভারতীয় মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হন।[৩৬] এছাড়াও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বের প্রায় মুসলমান তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বলে গণ্য করতেন। তাই তুরস্ক সাম্রাজ্য বিবেচিত হত খিলাফত হিসেবে।[৩৭] এজন্য তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা এবং সুলতানের রাজত্ব বহাল রাখার বিষয়টি বিশ্ব মুসলিম উন্মাহর ধর্মীয় অনুভূতি ও আবেগের বিষয়ে পরিণত হয়। যে কারণে ভারতীয় মুসলমানরাও মনে প্রাণে একাত্মতা অনুভব করেন।[৩৮] তাই ১৯১১ সালে ইটালী কর্তৃক তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত ত্রিপলী আক্রমণ সম্পর্কে ব্রিটেনের নীরবতা অবলম্বন, ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে সংঘটিত পরপর দুটি বল্কান যুদ্ধে তুরস্কের শত্রুদের পক্ষে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ বিশেষতঃ ব্রিটেনের পক্ষপাতমূলক ভূমিকা, কানপুরের মসজিদের ঘটনাবলী ইত্যাদি কারণে ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।[৩৯] ১৯১৩ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ আত্মনিয়ন্ত্রণ সর্মসূচী গ্রহণ করে। এ ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হয় যা রাজনীতি ও খেলাফত সমন্বয়ে এক নতুন রূপ গ্রহণ করে।[৪০]

এ সময় কয়েকটি সংবাদ পত্র তুরস্কের প্রতি ভারতের মুসলমানদের সহানুভূতি অর্জন এবং তাঁদের ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গি গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এগুলোর মধ্যে কলকাতা থেকে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সম্পাদনায় প্রকাশিত উর্দু পত্রিকা "আল হিলাল", লাহোর থেকে জাফর আলী খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকা "জমিদার" এবং দিল্লী থেকে মাওলানা মোহাম্মদ আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকা "কমরেড" ও উর্দু পত্রিকা "হামদার্দ" এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ পত্রিকাগুলোর ক্ষুরধার লেখনী মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবকে আরও উদ্দীপিত করার পাশাপাশি

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের মধ্যে ইসলামী চেতনার বিকাশ ঘটায়। ফলে ভারতের মুসলমানরা এ সময় প্যান-ইসলামীজমের ভাবাদর্শের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন।[৪১]

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলোর ন্যায় বাংলার শিক্ষিত মুসলমানরাও উপলব্ধি করেন যে, ব্রিটিশরা শুধু ভারতের মুসলমানদের সাথেই প্রতারণা করেনি, ভারতের বাইরেও তারা মুসলমানদের পরিত্যাগ করেছে। এর ফলে তাঁদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব আরও জোড়দার হয়। এমতাবস্থায় ভারতের তথা বাংলার মুসলিম রাজনীতিকগণ মুসলমান জনমতকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘটিত করার জন্য তুরস্কের প্রতি তাঁদের সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং আঃ রসুল, ড. আব্দুল্লাহ সোহরাওর্দীর সঙ্গে মিলিতভাবে তুরস্কের পক্ষে বাংলার মুসলমানদের সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করেন। তুরস্কের অনুকুলে বাংলার মুসলমানদের সহানুভূতি অর্জনে বাংলার মুসলিম রাজনীতিকগণ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও প্রচারণা চালান। এসময় ব্রিটিশ সরকারের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক নেতা মৌলভী মুজিবর রহমান তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের মুখপত্র "The Musalman" পত্রিকা ১৯১৩ সালের ২৩ মে "Come over into Mecadonia and help us" নামে সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল থেকে প্রকাশিত এক পুস্তিকা পাঁচ সংখ্যায় উদ্ধৃত করেন। এ পুস্তিকা উদ্ধৃত করার জন্য "The Musalman" পত্রিকা অফিসে বানা তল্লাসি চালানো হয় এবং "The Musalman" এর যে[৪২] সকল সংখ্যায় প্রকাশিত হয় সেগুলো সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯১৪ সালের ১৩ নভেম্বর মৌলভী মুজিবর রহমান "England Turkey and India Musalman" শিরোনামে "The Musalman" পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এর ফলে "The Musalman" পত্রিকাটি সরকারের রোষানলে পড়ে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারী মি. জি. জি. কামিং এক পত্রে "The Musalman" পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী মুজিবর রহমানকে সতর্ক করে দেন। এতদসত্ত্বেও মৌলভী মুজিবর রহমান তুরস্কের অনুকুলে প্রচারণা অব্যাহত রাখেন এবং "The Musalman" পত্রিকার মাধ্যমে বল্কান যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত তুর্কীদের সাহায্যের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯১৪ সালে সূচিত প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করলে ভারতের মুসলমানরা তুরস্কের প্রতিই তাঁদের নৈতিক ও মানষিক সমর্থন ব্যক্ত করেন।[৪৪] এ সমর্থনের জন্য ভারতীয় মুসলমান নেতাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।[৪৫]

প্রথম মহাযুদ্ধের এক পর্যায়ে তুর্কীদের আংশিক সফলতায় ভারত রক্ষা আইনে বলা হয় ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সরকার তুর্কী সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন[৪৬] করবে বলে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিবাদ বন্ধ রাখতে হবে।[৪৭]

আজাদ পত্রিকায় বলা হয়েছিল ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে তুরস্কের পক্ষে ভারতীয় মুসলমানরা সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তাই মুসলমান নেতাদের অনেকেই তখন ভারত রক্ষা আইন বলে অন্তরীণে আবদ্ধ হয়। যাঁদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মাহমুদ-উল-হাসান প্রমুখ। এর ফলে মুসলিম সমাজ রাজভক্তির পথ থেকে অনেকখানি সরে দাঁড়িয়েছিল।[৪৮] রাজনৈতিক অঙ্গণে মুসলমানদের এরূপ ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৪৯] এরপর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর চেষ্টায় ১৯১৫ সালে বোম্বাই-এ একই সঙ্গে লীগ ও কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে কংগ্রেসের পক্ষে নেতৃত্ব করেন এস. পি. সিংহ, আর লীগের সভাপতি হন মাজহারুল হক। এর মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসের সাথে লীগের যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় তারই ফলে হিন্দু-মুসলিম মিলনরূপ লাভ করে ১৯১৬ সালে "লক্ষ্মৌ প্যাক্টে"। প্যাক্টের তাৎপর্য তুলে ধরে পত্রিকাটিতে আরও বলা হয়েছিল যে, "লক্ষ্মৌ প্যাক্টে" ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস স্মরণীয় এ কারণে যে, এ প্যাক্টে কংগ্রেস স্বীকার করে নেয় যে মুসলিম লীগ মুসলিম ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেস লীগ যুক্তভাবে ভারতের দাবী ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করে। তাছাড়া এ চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী মেনে নিয়েছিল। বস্তুত লক্ষ্মৌ প্যাক্টের পরে কংগ্রেস ও লীগ অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান রাজনীতির ক্ষেত্রে একতাবদ্ধ হয়ে চলতে থাকে।[৫০]

গ্রেট ব্রিটেন ছিল মিত্রশক্তির অন্যতম সদস্য দেশ। তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ নেওয়ায় স্বভাবতই তা ব্রিটিশদের কোপানলে পতিত হয়। ব্রিটিশ সরকার ছিল ভারতীয় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় অধিপতি। আর তুরস্ক ছিল তাদের ধর্মগুরুর দেশ। এ দুইয়ের মধ্যে লড়াই বেধে

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়ায় তারা বড় একটা সমস্যায় পতিত হয়। মিত্র শক্তির দিক থেকে[৫১] ব্রিটিশ ভারত হতে তুর্কী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সমরাভিযান পরিচালনার প্রয়োজন হয়েছিল। তখন ভারতের মুসলমান সৈন্যরা পড়লো উভয় সংকটে। রাষ্ট্রীয় শাসনকর্তার আদেশে যুদ্ধে যেতে হবে, আর যুদ্ধ করতে হবে নিজেদের ধর্মগুরুর দেশ তুরস্কের বিরুদ্ধে। তাঁদের ভয় ছিল, হয়ত তুরস্ক খলিফার ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে। অন্য কথায় ঐ যুদ্ধে যোগদানের মানে ছিল নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁদের অস্ত্র ধারণ করা। অন্যদিকে ভারতের অমুসলিম সেনাদের সাথে মুসলমান সৈনিকদের সহযোগিতা না হলে ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ চালানোই ছিল মুশকিল। ব্রিটিশ বাহিনী মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে বাধা দিতে না পারলে ভারতকে তুর্কী-জার্মানীর সমবেত আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ছিল দুঃসাধ্য।[৫২]

এমতাবস্থায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বেগতিক হয়ে ভারতীয়দের সাহায্য কামনা করে। এ সময় মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আব্দুল বারী, মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ একদিকে ব্রিটিশ সরকারের সহায়তা করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান, অন্যদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দেন যে, তারা যেন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রতি এমন কোন আচরণ না করেন, যাতে মুসলমানদের মনে আঘাত লাগতে পারে। ভারতীয় কংগ্রেস এবং মহাত্মা গান্ধীও ঐ যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের সহায়তা করেন। ভারতবাসীকে এ সহায়তাদানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সচিব মন্টোগো ১৯১৭ সালের ১৮ আগস্ট তাঁদেরকে যুদ্ধ শেষে দায়গ্রস্থ সরকার দেবেন বলে ওয়াদা করেন, যা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।[৫৩] এছাড়াও মুসলমানদের খিলাফত এবং পবিত্র স্থান সমূহের সম্মান রক্ষার দাবী ব্রিটিশ সরকার পূরণ করবে – সেটাও মন্টেগো চেমসফোর্টের রিপোর্টে উল্লেখ থাকলেও মুসলমান রাজনীতিকগণ এতে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করতেন।[৫৪] ফলে ভারতে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে।[৫৫]

যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় মুসলমানদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে।[৫৬] ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তুরস্কের খেলাফত ও খলিফার মর্যাদা রক্ষা করা হবে।[৫৭] ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি বড়লাট হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলেন খিলাফতের শাস্ত্র বিহিত সব অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে। মুসলমানদের ধর্মীয় স্থানের কোন ক্ষতি সাধন করা হবে না। কেবল ব্রিটিশ

Dhaka University Institutional Repository

ভারত রক্ষা করার জন্যই এ অভিযান চালানো হচ্ছে।[৫৮] বিলাতের ব্রিটিশ মন্ত্রী সভায়ও এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।[৫৯]

এ আশ্বাসের প্রেক্ষিতে উপমহাদেশের রাজভক্ত মুসলমান প্রজারা দলে দলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। তাঁরা সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। তাঁরা ব্রিটিশ মুকুট রক্ষার্থে ব্রিটিশ ও অষ্ট্রেলীয় সেনাবাহিনীর পাশাপাশি দার্দানেলিশ প্রণালীতে তুরস্ক সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম পড়ালেখা ত্যাগ করে ১৯১৭ সালে বাঙালী পল্টনে ভর্তি হন। সামরিক ট্রেনিং শেষে তাঁর পোস্টিং হয় করাচীতে। তিনি হাবিলদার পদে উন্নীত হন এবং যুদ্ধ শেষে কলকাতায় ফিরে আসেন। ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ উনিশ বছর বয়সে ১৯১৪ সালে ঐ যুদ্ধে যোগ দেন এবং স্বেচ্ছাসেবীরূপে মেসোপটেমিয়ায় যান। নির্ভিক সৈনিক বলে ব্রিটিশের সামরিক কর্তাদের[৬০] নিকট তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি অবৈতনিক লেফটেন্যান্ট পদে নিয়োজিত ছিলেন। যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বল বীর্জের ফলে এশিয়ায় ব্রিটিশ তথা মিত্রশক্তির বিজয় সূচিত হয়েছিল তাতে মুসলমান সৈনিকদের বিরাট অবদান ছিল।[৬১]

১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে তুরস্ক ব্রিটেন ও তার মিত্রদের[৬২] কাছে পরাজিত হলে তুরস্কের সার্বভৌমত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। কারণ যুদ্ধ শেষে মিত্রশক্তি তুরস্কের বেশ কিছু অংশ দখল করে নেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেয়। এতে সারা বিশ্বের মুসলমানগণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন।[৬৩] তেমনি ভারতের মুসলমানগণ তুর্কী খিলাফত ও খলিফার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন।[৬৪]

১৯১৮ সালে অক্টোবরে তুর্কীরা মিত্র শক্তির নিকট পরাজিত হয়[৬৫] এবং ১৯১৮ সালের নভেম্বরে যুদ্ধের অবসান ঘটে। তুরস্ক মিত্রশক্তির নিকট পরাজিত হওয়ায় কনষ্টান্টিনোপল তাঁদের হাতছাড়া হয় এবং তারা ১৯১৮ সালের ৩০ অক্টোবর যুদ্ধ বিরতির আবেদন করে।[৬৬]

১৯১৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত ফিলিস্তিন তুরস্কের অধীনে ছিল। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং ফিলিস্তিনসহ[৬৭] মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়া-এ তিনটি তুরস্ক সাম্রাজ্যভূক্ত দেশ ব্রিটিশ ও ফরাসীর অধিগত হয়।[৬৮] যুদ্ধের প্রাক্কালে মিত্রশক্তি ভয় পেয়েছিল যে, তুরস্ক হয়ত বা এ যুদ্ধকে ধর্ম যুদ্ধ নামে অভিহিত করে সমগ্র মুসলিম জগতকে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিবে। তাই যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আরবীয় প্রতিনিধিদের সাথে ব্রিটিশদের সংযোগ স্থাপন আরও নতুন ও ঘনিষ্ঠভাবে আরম্ভ হয়। শেরিফ হোসাইন কর্তৃক প্রস্তাবিত আরব সীমানার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল সমূহে ব্রিটিশরা আরবীয়দের স্বাধীনতা স্বীকার করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পবিত্র স্থানসমূহকে ব্রিটেন সর্বপ্রকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। সময় ও প্রয়োজন হলে আরবীয়রা ব্রিটেনের নিকট হতে আর্থিক ও রাজনৈতিক সাহায্য পাবে। যুদ্ধ শেষ হলে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার জন্য ১৯১৬ সালে মিত্রশক্তি সমূহ (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জারশাসিত রাশিয়া) এক গোপন চুক্তি সম্পাদন করেছিল। যা সাইক্স পিকট (Sykes Picot) চুক্তি নামে পরিচিত।[৬৯] অর্থাৎ যুদ্ধ শেষে তুরস্ককে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ-বাঁটোয়ারা করার ষড়যন্ত্র হল।[৭০] সাইক্স পিকট চুক্তিতে ব্রিটেন হোসাইনকে যে সব অঞ্চলের স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাতে আরো কিছু যোগ করা হয়।[৭১] তাই যুদ্ধ চলাকালে ১৯১৬ সালে মক্কার শেরিফ হোসাইন ইবনে আলী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্ররোচনা ও সহায়তায় আরব জাতীয়তাবাদের ধূঁয়া তোলেন এবং তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যে হেজাজ চারশ বছর ধরে তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, শেরিফ হোসাইন তাকে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শেরিফ হোসাইনের সাথে যে সব ওয়াদা করেছিলেন, সে সবের মধ্যে তারা আর নেই। ব্রিটিশ মিত্রশক্তি হেজাজকে খণ্ড খণ্ড করে দেয়। তাঁরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তুরস্ক থেকে কেড়ে নেয়া অঞ্চল গুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়।[৭২]

এছাড়াও যুদ্ধের পর ব্রিটিশের মিত্র ফরাসী কর্তৃপক্ষ মরক্কোতে এক নির্মম পৈশাচিক নীতি অবলম্বন করে। মরক্কোর মুসলমানদিগকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য দলে দলে খ্রিষ্টান মিশনারী ও সিস্টার আমদানি করে দেশ ছেঁয়ে ফেলে। তাঁরা যাতে বিনা বাধায় দীক্ষাদান কার্য চালিয়ে যেতে পারেন তজ্জন্য ইসলাম প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়।[৭৩]

যুদ্ধ শেষে মিত্রশক্তির এরূপ কার্যকলাপ এবং তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদের জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন।[৭৪] এতে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্যান-ইসলামী মনোভাবের সৃষ্টি হয়।[৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

তদ্রূপ বাংলার মুসলমান রাজনীতিকগণও এ সময় পরাজিত তুরস্ক ও খিলাফতের ভাগ্য সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন।[৭৬] ফলে মুসলমানদের মনে খিলাফত প্রশ্নে বিরাট অসন্তোষ সৃষ্টি হয় যা মুসলমান জনগণকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে।[৭৭]

১৯১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার মুসলিম নেতা এ. কে ফজলুল হক সভাপতির ভাষণে ব্রিটেন ও তার মিত্ররা তুর্কী সাম্রাজ্যকে যে ভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করার আয়োজনে লিপ্ত হয় তাতে তুরস্কের খলিফা ও পবিত্র স্থান সমূহের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর অভিভাষণে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে একথা স্মরণ করিয়ে দেন যে,

> "All questions relating to the Khilafat and the Protection of our holy places are intimately bound up with the vital articles of our faith ... We are loyal Subjects of the Rulers, and are prepared to prove our Loyalty in actual practice by making sacrifices. But this temporal Loyalty is subject to the Limitation imposed by our undoubted Loyalty to our faith".

খিলাফতের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে তিনি তাঁর ভাষণে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর প্রতি সতর্কবাণী উচ্ছারণ করে বলেন যে,

> "... in making sacrifices one after another, the dividing line may soon be reached; we need hardly emphasize that in case there is a conflict between Divine Laws and the mandates of our rulers, every true Musalman will allow the Divine commandments to prevail over human laws, even at the risk of Laying down his life".

১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিত্রশক্তি তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করার ব্যবস্থা করে।[৭৮] সিরিয়া, ইরাক, আরব, আর্মেনিয়া, ফিলিস্তিন, পূর্ব জর্ডান প্রভৃতি দেশ তুরস্কের হাতছাড়া হয়ে যায়। সিরিয়ার উপর ফ্রান্সের এবং ইরাক ও পূর্ব জর্ডানের উপর ব্রিটিশ প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়া ও ইউরোপীয় তুরস্কের মধ্যবর্তী বসফোরাস প্রণালী সর্বজাতিক অধিকারভুক্ত হয়। শেরিফ হোসাইন ইংরেজদের

Dhaka University Institutional Repository

তন্নিবাহক সেজে তাঁর এক পুত্র আমীর ফয়সালকে ইরাকের বাদশাহ এবং অন্য পুত্র আমীর আব্দুল্লাহকে পূর্বজর্ডানের অধিপতির আসনে অধিষ্ঠিত করেন।[৮৯]

মিত্র শক্তি কর্তৃক তুরস্ক সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে এরূপ ভাগাভাগি এবং শান্তি চুক্তির উৎসব পালনের আয়োজনের সময় পূর্ব বাংলার সিলেটের মৌলভী আব্দুল করিম যশোরে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষনে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ওয়াদাভঙ্গ ও তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁদের আগ্রাসন নীতির কঠোর সমালোচনা করেন এবং বলেন, "তুরস্কের প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানরা শান্তিচুক্তির উৎসবে যোগাদান করতে পারে না। তাঁর ভাষায়,

> "I can not persuade myself to believe that a gentlemen of Mr. Loyd George's responsible position could have so far forgotten himself as to be guilty of such deliberate duplicity and dishonesty as to have solemnly given a pledge meaning all the time to break it at the first convenient opportunity. My idea is that when great difficulties stared him in the face and despair we might over whelmed him and when the fate of the empire in his change was hanging in the balance, he honestly made the promise intending to keep it. But when the danger was over, when the stability of the empire was assured and he found himself master of the situation, the lust of territorial aggrandesment and the religious bigotry of a descendant of the mediaeval crusaders got the better of his sense of honour and justice, and he is now trying to back out of his commitments.
>
> As long as the fate of the Musalmans of the Turkish empire is not satisfactorily settled, their co-religionists in India can never know peace of mind. It was only natural, therefore, that they should not be in a mood to take part in the festivities in connection with what was called the peace celebrations."[৮০]

Dhaka University Institutional Repository

তুরস্ককে ছিন্নভিন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও পশ্চিমা শক্তিবর্গ খুশি হতে পারেনি। তাই বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরেও ফরাসী ও ব্রিটেনের সমর্থনে এবং গোটা মিত্রশক্তির নৌবহরের সহযোগিতায় গ্রীকরা ১৯১৯ সালের ১৩ মে বিনা উস্কানীতে পর্যুদস্ত তুরস্কের উপর হামলা চালিয়ে স্মার্না দখল করে নেয় এবং আনাতোলিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।[৮১]

শেষ পর্যন্ত ১৯২০ সালের আগস্টের সেভার্স চুক্তিতে তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশের নিকট ক্রীড়ানক হয়ে পড়েন এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, গ্রীস, ইতালী ও আরবদের মাঝে ভাগবাটোয়ারা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৮২]

তুরস্ক যেহেতু মুসলিম ভারতের ধর্মীয় নেতৃত্বের কেবলা ও কা'বা তথা খিলাফতের প্রাণ কেন্দ্র[৮৩] সেহেতু উপমহাদেশের মুসলমানরা ইতিমধ্যেই খিলাফত বিষয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে ভাবলেন,[৮৪] তুরস্কের শক্তি ও স্বাধীনতা ছাড়া খিলাফত টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।[৮৫] তাই তুরস্কের খিলাফত এবং ইসলামের পবিত্র স্থান সমূহ রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং তার প্রেক্ষিতে তাঁদের মাঝে যে প্যান-ইসলামিজম মনোভাবের সৃষ্টি হয়[৮৬] তাতে তুর্কী খিলাফতের প্রতি মুসলমানগণ ধর্মীয়ভাবে সমর্থন দেওয়ায় তাঁদের মাঝে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্যান-ইসলামিজম মনোভাব আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।[৮৭] যা যে কোন আন্দোলনের চেয়ে এ মনোভাব অনেক জোড়ালো। যদিও খলিফা বড় ধরনের কিছু নয় এবং অনেক মসজিদের খুৎবাতেও তাঁকে উল্লেখ করা হতনা, তথাপি খিলাফতের প্রতি তাঁদের আশক্তি[৮৮] এবং খলিফা ও খিলাফতের প্রতি ধর্মীয়ভাবে মনোভাব সৃষ্টি হয়ে[৮৯] তাঁরা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে উঠেন।[৯০]

তাই ভারতীয় মুসলমানরা খিলাফতের মাধ্যমে একই বিশ্বাস, সভ্যতা, শিক্ষা, একই রাষ্ট্র– এ ধরনের ঐক্য সৃষ্টি হবার মনোভাবে আবিষ্ট হয়ে[৯১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরপরই খিলাফতের বিরুদ্ধে মিত্র শক্তি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ভারতীয় মুসলমানরা তথা বাংলার মুসলমানরা এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তুরস্কের খিলাফত রক্ষার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আন্দোলন শুরু করেন। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক আকারে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. মুহাম্মদ আলী আসগার খান, *আধুনিক তুরস্কের ইতিহাস*, প্রকাশক বাংলা একাডেমী: ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১০৬

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

৬. এস. ঘোষ, *পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাস*, জে. এন ঘোষ এন্ড সন্স, ৬, বংকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ২

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

৮. মুহাম্মদ আলী আসগার খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৬

৯. অধ্যাপক এস. ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

১৭. আব্দুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, বড়াল প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪৪

১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

২০. অধ্যাপক এস. ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

২৯. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলার খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃ. ১

৩০. Francis Robinson, *SEPARATISM AMONG INDIN MUSLIMS* (The Politics of the United Province's Muslims) 1860-1923, Cambridge University Press-1974, Page No. 290

৩১. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকা (১৯০৫-১৯২৫)*, এম. ফিল অভিসন্দর্ভ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ. ৯১

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

৩৩. মালঞ্চ, কলকাতা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৬, মার্চ-এপ্রিল, ১৯২০, পৃ. ৯৫০

৩৪. শামছুন নাহার, *বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদ সাময়িক পত্রের ভূমিকা (১৯০৫-৪৭)*, পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ. ১৭

৩৫. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪

৩৬. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 290

৩৭. আবু আল সাঈদ, *মুসলিম শাসনকাল ধর্মনিরপেক্ষতা ও বঙ্গবন্ধু (১২০৬-১৯৭৫)*, আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৭৮

৩৮. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০)*, বিজয় রায়, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০১, পৃ. ৭৬

৩৯. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯১

৪০. শামছুন নাহার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

৪১. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১

৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

৪৫. Santimoy Ray, *Freedom Movement and Indian Muslims*, People's Publishing House Private Limited, New Delhi, January, 1979, p. 48

৪৬. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 290

৪৭. *Ibid*, p. 291

৪৮. শামছুন নাহার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫০

৪৯. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 48

৫০. শামছুন নাহার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫১

৫১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১

৫২. মালঞ্চ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫০

৫৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২

৫৪. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 290

৫৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২

৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

৫৭. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 291

৫৮. মালঞ্চ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫০

৫৯. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২

৬০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

৬২. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯১

৬৩. আবু আল সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৯

৬৪. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২

৬৫. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 291

৬৬. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

৬৭. *সওগাত পত্রিকা*, পৌষ, ১৩৫৩

৬৮. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

৬৯. *সওগাত পত্রিকা*, পৌষ, ১৩৫৩

৭০. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 291

৭১. *সওগাত পত্রিকা*, পৌষ, ১৩৫৩

৭২. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

৭৩. *সওগাত পত্রিকা*, আশ্বিন, ১৩৫৪

৭৪. *সওগাত পত্রিকা*, জৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩৫৫

৭৫. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 291

৭৬. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২

৭৭. প্রনব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারত-২য় খণ্ড*, নর্থলেক, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৪

৭৮. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২

৭৯. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

৮০. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের দশ-দিশারী*, ইফাবা গবেষণা, ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রিন্টিং প্রেস, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ১৪১

৮১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলেমার ভূমিকা*, ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ৫১

৮২. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 291

৮৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

৮৪. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 49

৮৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

৮৬. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 291

৮৭. Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, (The response of the Shi'i and Sunni Muslims to the twenteeth century), Macmillan Education Lta., Houndmills Basingstoke, Hampshire, R.G 212 XS and London, 1982, p. 115

৮৮. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 291

Dhaka University Institutional Repository

৮৯. L. S. May, *The Evolution of Indo-Muslim Thought, From 1857 to the Present*, Uppal Publishing House, New Delhi, 110002, 1987, p. 232

৯০. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 291

৯১. Dr. L. S. May, *op. cit.*, p. 233

৯২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস, ভলিউম-১ (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। প্রথম বাংলা সংস্করণ-পৌষ/১৪০০, ডিসেম্বর/১৯৯৩ ইংরেজি সংস্করণ-সেপ্টেম্বর/১৯৯২, পৃ. ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

তুরস্ক খিলাফতের বিপর্যয়ে ভারতের প্রতিক্রিয়া

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে ভারতের মুসলমানগণ ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ এবং ফ্রান্স তুরস্কের এশিয়া অঞ্চলসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। একজন হাইকমিশনারের মাধ্যমে মিত্র শক্তি তুরস্কের শাসনভার গ্রহণ করে।[১] তুরস্কের প্রতি ইংরেজদের এরূপ অবিচারের জন্য ভারতের মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাঁরা প্রতিশোধ গ্রহণে মত্ত হয়ে উঠেন।[২] ভারতের মুসলমানরা যেহেতু ব্রিটিশদের প্রজা সেহেতু তুরস্কের মুসলিম খিলাফতকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতের মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছাড়া আর কোন পথ ছিলনা।[৩] তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর পরই এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতের মুসলমানরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খিলাফত রক্ষার জন্য খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন[৪] এবং আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভারতে একটি খিলাফত কমিটি গঠন করতে মনস্থ করেন।[৫]

জানুয়ারি ১৯১৯ খিলাফতের কিছু কার্যক্রমের জন্য হাকিম আজমল খাঁন কিছু প্রশ্ন সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন এবং আনসারী ইহার প্রভাব বিস্তারের জন্য বিতরণের কাজে সাহায্য করেন এবং দেওবন্দবাসীদের একটি কপি গ্রহণের জন্য নিশ্চিত করলেন।[৬] ফিরিঙ্গীমহলের অন্তর্ভুক্ত বেশীর ভাগ ইহাতে স্বাক্ষর করেন। মুসলমানদের পবিত্র ভূমিগুলি মুসলমানদের দখলে আনতে যদি নাস্তিকদের কাছ থেকে কোন বাধা আসে তাহলে সকল মুসলমানরা অবশ্যই যুদ্ধ করবেন।[৭] ইসলামের আইন এবং হাদিস বিশারদ শিক্ষক[৮] আব্দুল বারীর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কীত ফিরিঙ্গীমহলের ১১জন উলামা ঘোষণা করলেন যে, জেহাদ-নামাজ ও অজুর মতই আবশ্যকীয়। এলাহাবাদ, কানপুর এবং দিল্লীর কিছু সংখ্যক উলামা এবং বেরেলীর আহাম্মদ রেজা খান, ফিরিঙ্গীমহলের মৌলভী আঃ হামিদ এবং দেওবন্দের উলামাগণ আব্দুল বারীকে বিরোধিতা করলেন। খলিফা অথবা পবিত্রভূমিসমূহ নিয়ন্ত্রণে আনতে

Dhaka University Institutional Repository

নাস্তিকদের কাছ থেকে যদি বাধা আসে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে "জেহাদ" ফতোয়াজারীর পর বহু বিশ্বাসীরা জেহাদে যোগদান করলেন। এ উদ্দেশ্যে আব্দুল বারী বিভিন্ন মতের উলামাদের নিয়ে সভার আয়োজন করলেন। ডাঃ আনসারী, হাকিম আজমল খাঁন এবং দিল্লীর কিছু সংখ্যক উলামা জনাব বারীকে সমর্থন করলেন। কিন্তু দেওবন্দবাসীদের বিরোধিতার জন্য সভা কার্যকর হলনা। ইতিমধ্যে তিনি ইউ. পি. এর বিভিন্ন গ্রামে সংগঠন গড়ার জন্য চেষ্টা করলেন এবং একজন পেশাগত সম্পাদকের সাহায্যে "আখোয়াত" নামে একটি মৌলিক সাময়িকি প্রকাশ করলেন।[৯] ১৯১৯ সনের এপ্রিল মাসে মওলানা বারী এ ধারণাটি সকল জায়গায় ছড়িয়ে দিলেন এবং মুসলিম দেশগুলোতে একটি ভারতীয় মুসলিম মিশন প্রেরণ করলেন এবং ভাইসরয়ের নিকট একটি প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন।[১০] লক্ষ্ণৌতে সর্বভারতীয় মুসলিম অধিবেশনে খিলাফত সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। তাঁর নিজস্ব পত্রিকায়ও দ্রুত খ্রিষ্টান ও সরকার বিরোধী ভূমিকা পালন করে[১১] এমনকি সময় সময় "জেহাদ" সম্পর্কেও ইঙ্গিত করা হত। মওলানা যেভাবে তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে ছিলেন তাতে চির আস্থাশীল হারকোর্ট বাটলারও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি চিন্তা করলেন যে, তাঁর শতর্ক পরিচালনাকারীর প্রয়োজন। তিনি ভাইসরয়ের নিকট পত্র দেন। পত্রটি হল:- "I am trying to influence him through the people on whom he relies financially. My problem is to keep the Musalman women right. If they get a handle, as they did over the Cawnpur mosque incident; they will force their husbands and male relations to do something for Islam. No Government in the East can control a combination of priest and women. Hence the importance of not making a martyr of Abdul Bari".[১২]

উলামা এবং ইয়ং পার্টির মধ্যে ব্যাপক ভিন্নতা থাকা সত্বেও খিলাফত আন্দোলনের অসাধারণ শক্তি ছিল তাঁদের সাহসী ভূমিকা এবং তাঁদের সাহসী ভূমিকা ছিল আন্দোলনের বড় ধরনের হাতিয়ারস্বরূপ। ইয়ং পার্টির সদস্যরা খিলাফত আন্দোলনকে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং উলামারা মূল চালিকা শক্তি হিসেবে আন্দোলনকে অগ্রগতির দিকে নিয়েছিলেন। যাহোক, খিলাফত অভিযান সার্বিকভাবে পরিচালিত হয়েছিল ডাঃ আনসারী এবং হাকিম আজমল খানের নেতৃত্বে, যাঁরা ১৯১৮ সনে দিল্লীতে লীগ এবং কংগ্রেস অধিবেশনে

Dhaka University Institutional Repository

তুর্কীদের নিয়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, যা ঐ বছর মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। দিল্লী অধিবেশন শেষে ডাঃ আনসারী উক্ত আন্দোলনে ভারতীয় উলামাদেরকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করতে চেষ্টা করতে ছিলেন।[১৩]

তুরস্কের মুসলিম খিলাফত রক্ষা করার আন্দোলন পরিচালনার জন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভারতে একটি খিলাফত কমিটি গঠন করতে মনস্থ করলেন।[১৪] ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে বোম্বাই শহরে আব্দুল বারীর একজন ভক্ত বোম্বের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী শেঠ মিয়া মোহাম্মদ জান ছোটানীর সভাপতিত্বে খিলাফত কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতিসহ বেশীর ভাগ লোকদেরকে নগরের ধনাঢ্য মুসলিম বর্ণিকদের কাছ থেকে সরিয়ে আনা হল। কমিটি সরকারের নিকট তাঁদের একটি প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারই প্রেক্ষিতে পরের বছর লন্ডনে খিলাফত প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা বহু সপ্তাহ ব্যাপী Lioyd George-এর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।[১৫]

ইতিপূর্বে খিলাফত সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের সাথে জনবল বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ আনসারী কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে দিল্লীর লীগ অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন যা পূর্বের কোন অধিবেশনে এত সংখ্যক মুসলমান যোগদান করেনি। তাঁদেরকে সংবর্ধনা দেয়া এবং আপ্যায়ন করা হয়েছিল অত্যন্ত সম্মানের সাথে।[১৬] তাঁদের মাঝে কাসুরের মৌলভী গোলাম মহিউদ্দিনের মতে মুসলমানদের ধর্ম এবং রাজনীতি এক যদিও অন্যান্য উলামারা ভিন্ন বলেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, তাঁদের ধর্মই ছিল রাজনীতি।[১৭] নওয়াব শাহ উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন যে, খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতির উন্নয়ন ঘটবে।[১৮] খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে ফিরিঙ্গীমহল এবং উলামা পার্টিও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।[১৯] পরবর্তীতে আব্দুল বারী ও ফিরিঙ্গীমহল উলামাদের বৃহৎ অংশের নিরলস সমর্থনে ভারতীয় খিলাফত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।[২০]

খিলাফত আন্দোলন সহ ব্রিটিশ বিরোধী যে কোন আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ সালের মার্চ-এ "রাউলাট বিল" উত্থাপন করে এবং ১৮ মার্চ তা এ্যাক্টে পরিণত করে। বিলের উল্লেখযোগ্য ধারা ছিল:-

Dhaka University Institutional Repository

১. সরকারী কর্মকর্তাগণ যে কোন ব্যক্তির নিকট থেকে জামানত ও মুচলিকা তলব করতে পারবেন।

২. যে কোন ব্যক্তিকে নজরবন্দি করতে পারবেন।

৩. পত্রিকায় বিবৃতি প্রকাশ, পত্রিকা বিতরণ, মিছিল করন ও সভাসমিতিতে যোগদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবেন।

৪. বিনা গ্রেফতারী পরোয়ানা ও বিনা কৈফিয়তে যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারবেন।

৫. আদালতে বিচার ছাড়াই জেলে আটক রাখতে পারবেন।[২১]

উক্ত বিলের বিরুদ্ধে ভারতের নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ করেন। এ বিলে বিচার বিভাগকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়ায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়। প্রতিরক্ষা বিলে সরকারকে সকল ধরনের ক্ষমতা দেওয়া হয় যা পূর্বের প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকেও অতিক্রম করে। তাই সরকারের এ ধরনের দমনমূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে মার্চ মাসে বিভিন্ন পত্রিকায় এবং জন সমাবেশে প্রতিবাদ করা হয়।[২২] ভারতীয় রাজনীতির অগ্রদূত গান্ধীজি রাওলাট এ্যাক্ট প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এ এ্যাক্টটি তাঁকে রীতিমত হতভম্ব করেছে। এ এ্যাক্টে ব্রিটিশ সরকার তাঁর অনুগত নাগরিকদের উপর চিরদিনের জন্য সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী থাকবে। ধর্মীয় চেতনায় বিশ্বাসী ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের প্রণীত ধর্মীয় পরিপন্থী নীতির বিরুদ্ধে[২৩] ১৯১৯ সালের এপ্রিলের ৬ তারিখে জাতীয়ভাবে একটি প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।[২৪] আন্দোলন করার দায়ে সরকার ১৯১৯ সালের ১০ এপ্রিল পাঞ্জাবের ডঃ সায়ফুদ্দিন কিচলু ও সত্যপালকে গ্রেফতার ও দ্বীপান্তর করে। ১৫ এপ্রিল লাহোর ও অমৃতস্বরে সামরিক আইন জারী করা হয়। উক্ত এ্যাক্টের প্রতিবাদে পাঞ্জাব নেতৃবৃন্দ ১৩ এপ্রিল অমৃতস্বরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে। ঐ দিন ভোরে ১৪৪ ধারা জারী করে মিছিল ও সভা সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়, কিন্তু নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জনসাধারণ সভায় যোগদান করেন। পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার মাইকেল সেনাপতি জেনারেল ডায়ারকে প্রতিবাদরত নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দেন।[২৫] জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে নিরস্ত্র জনতার উপর সশস্ত্র বাহিনীর গুলিবর্ষনে এক হাজারের অধিক লোক নিহত এবং কয়েক হাজার লোক আহত হন। কয়েক

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তাহব্যাপী সান্ধ্য আইন জারী ছিল।[২৬] সেদিন সন্ধ্যায় লাহোরে অমৃতস্বরের ঘটনার সংবাদ পৌঁছে এবং জানা যায় মিঃ গান্ধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাই সেখানে প্রতিবাদ হয়। অন্যান্য জায়গাও যেমন কাশোর ও গুজরানওয়ালায় উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে সমাবেশ ঘটে। জনগণ উত্তেজিত হয়ে রেল যোগাযোগ এবং টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেন।[২৭] জালিয়ানওয়ালাবাগে তখন যে কত লোক ছিল তা ঠিক করে বলা কঠিন। কারণ সেদিন নানা স্থান থেকে বহু অশিক্ষিত লোক শিখদের বৈশাখী পর্ব উপলক্ষে এসেছিলেন। জেনারেল ডায়ার ৫০০ লোক নিহত এবং ১৫০০ লোক আহত হয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর সংখ্যা অনেক বেশী। দুদিন পর কর্তৃপক্ষ হঠাৎ গাড়ী করে মৃতদেহগুলো নিয়ে যায়।[২৮] উক্ত বিয়োগান্ত ঘটনা মিঃ গান্ধীকে প্রভাবিত করে।[২৯] রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ সংগঠিত হয় তা পরবর্তীতে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে রূপায়িত হয়।[৩০]

তুরস্কের খলিফাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাঁর এলাকাসমূহ ফেরৎ দেবার দাবীতে মুসলমানগণ এক ব্যাপক আন্দোলনের জন্য লক্ষ্ণৌতে ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে মওলানা আব্দুল বারী, হাকিম আজমল খাঁন ও ছোটানীর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি গঠন করা হয়। ছোটানী এবং মাওলানা শওকত আলী কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির যথাক্রমে সভাপতি এবং সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। যদিও এর পূর্বে ছোটানী সহ বোম্বের ব্যবসায়ীরা "খিলাফত মজলিশ" নামক একটি আঞ্চলিক খিলাফত কমিটি গঠন করেছিলেন যা দ্বিতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির অঙ্গীভূত হয়। "খিলাফত" নামক একটি উর্দূ পত্রিকাও এ সংস্থা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে সারা ভারতে এর শাখা-প্রশাখা গঠিত হয়।[৩১] খিলাফত আন্দোলনে মুসলমানদের দাবী ছিল যে,

১. তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখতে হবে এবং খিলাফতকে ভেঙ্গে দেয়া যাবে না।

২. ইসলাম ধর্মের স্বার্থ রক্ষার্থে খলিফার হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকতে হবে।

৩. কোন প্রকার প্রটেকশন ছাড়াই আরবদ্বীপের উপর মুসলমানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মুসলমানদের পবিত্র স্থান সমূহের তদারকির ভার খলিফার হাতে ন্যস্ত করতে হবে।

১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান শুরু হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অসংখ্য খিলাফত কমিটি গঠিত হয়।[৩২]

তুর্কী সাম্রাজ্যের বিপর্যয় হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ মূলক সভা-সমিতি হতে থাকে এবং খিলাফত আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। মুসলমানদের পবিত্রস্থান সমূহকে তুরস্কের খলিফার অধীনে রাখার দাবী জোড়ালো হয়ে উঠে।[৩৩] তুর্কী সুলতান এবং সম্রাটের প্রতি মুসলমানদের আসক্তির গভীরতা যাচাইয়ের জন্য মুসলিম লীগ কাউন্সিল ১৯১৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌতে সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনের আয়োজন করে।[৩৪] লক্ষ্ণৌ সম্মেলন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[৩৫] পর্যায়ক্রমে আব্দুল বারী ও ইব্রাহীম হারুন খাঁন জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি ও কয়েক হাজার মুসলমান অংশগ্রহণ করেন।[৩৬] কখনও এতসংখ্যক উলামা একসাথে অন্যকোন সভায় সমবেত হয়নি। মূলত এ সভাটি উলামাদের কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল। তাঁদের ছাড়াও ফিরিঙ্গীমহলে কর্মরত অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। যেমন দিল্লীর খাজা হাসান নিজামী, এলাহাবাদের মুহাম্মদ ফকির, মাদ্রাজের আব্দুল মজিদ শারার, বিহারের মুহাম্মদ সাজ্জাদ এবং বুদাউনের আব্দুল মজিদ।[৩৭] বাংলা থেকে ঐ সম্মেলনে এ. কে. ফজলুল হক, বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাশেম, মৌলভী মুজিবর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্মেলনে খিলাফত ও তুর্কী খলিফার অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় যে,

১. তুরস্ক খলিফার ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখা হোক,

২. তুরস্ক সাম্রাজ্যের বড় বড় অঞ্চল যেমন ইরাক, আরব, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, আর্মেনিয়া ইত্যাদিকে তুর্কী শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অমুসলিম শাসনাধীন রাখার কারণে এ অধিবেশন অসন্তোষ প্রকাশ করছে। আরব উপদ্বীপকে অনৈসলামিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার উপর এ অধিবেশন গুরুত্ব আরোপ করছে।

৩. প্রেস এশিয়া মাইনরকে ব্রিটিশ প্রদত্ত ওয়াদা মোতাবেক তুর্কী শাসনাধীন রাখা হোক এবং কনষ্টান্টিনোপলে পূর্ববৎ তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজধানী বহাল রাখা হোক।

Dhaka University Institutional Repository

৪. স্মার্না থেকে গ্রীকদের বহিস্কার এবং তাঁদের প্রতি অত্যাচার করার জন্য এ সভা দুঃখ প্রকাশ করছে।

৫. উক্ত চারটি সিদ্ধান্ত ভাইসরয়ের নিকট পাঠানো হোক এবং সুপারিশ সহ প্রস্তাবগুলো ইম্পীরিয়্যাল গভর্নমেন্টের নিকট পৌছানোর জন্য অনুরোধ করা হোক।

৬. ১৭ অক্টোবর সারা ভারতে তুরস্কের জন্য সভাসমিতিসহ দোয়া দিবস (খিলাফত) পালন করা হোক।[৩৮]

ছোটানী কর্তৃক প্রণীত সম্মেলনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উলামাদের প্রভাব ছিল। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৭ অক্টোবর শুক্রবার খিলাফত দিবস পালন করার পাশাপাশি সারাভারতে অসংখ্য খিলাফতের শাখার মাধ্যমে বোম্বাইতে সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি গঠন করা হবে। খালেকুজ্জামানের সহায়তায় ফিরিঙ্গীমহল কমিটির কাঠামো দাঁড় করালেন।[৩৯] হিন্দুদের সমর্থন আদায়ের জন্য আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।[৪০]

ঐ সময়ে লণ্ডনে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার সমন্বয়ে গঠিত শান্তি কমিটি শান্তি চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করতেছিল। উক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি কমিটির উপর প্রভাব বিস্তার করা এবং ব্রিটিশ সরকারকে খিলাফত ও তুরস্কের ব্যাপারে ভারতের মুসলমানদের আশা ও অনুভূতি সম্পর্কে অবহিত করা।[৪১]

উক্ত সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ১৭ অক্টোবর শুক্রবার সারা ভারতে হরতাল সহ প্রথম খিলাফত দিবস পালিত হয়। জু'মার নামাজের পর খিলাফতের স্থায়িত্বের জন্য মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করা হয়।[৪২]

১৯১৯ সনের সেপ্টেম্বরে উলামারা মুসলিম রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন এবং লক্ষ্ণৌর কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সভায় তাঁদেরকে আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি দেয়া হয়। খিলাফত দিনকে ধরে রাখার জন্য গান্ধীকে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসেবে মুসলিম রাজনীতিতে আনা হয়। এক সপ্তাহ পূর্বেই গান্ধীজি খিলাফতের পক্ষে কাজ করার জন্য তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।[৪৩] কারণ গান্ধীজি দেখলেন যে, মুসলমানদের সমর্থন ছাড়া ভারতের "স্বরাজ" আন্দোলন সম্পূর্ণ সফল হতে পারবে না। কি করে স্বরাজ আন্দোলনকে

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত আন্দোলনে রূপায়িত করা যায় তিনি তার পথ খুঁজতেছিলেন। মুসলমানদের তরফ থেকে খিলাফত কমিটি ঠিক করলেন, বড় লাটের সাথে দেখা করে, তাঁদের দাবীগুলো উপস্থাপন করবেন। দাবী না মানলে সারা ভারতে আন্দোলন শুরু করবেন। গান্ধীজিও এ খিলাফত আন্দোলনে নেতৃত্ব করতে রাজী হয়ে যান[৪৪] এবং বোম্বের বিশাল মুসলিম সভায় তিনি যোগদান করে উপস্থিতিদের উদ্বুদ্ধ হতে উৎসাহিত করেন।[৪৫] অধিকন্তু তাঁর আগ্রহটা ছিল বর্ণনাতীত। খিলাফত দিনটা ধরে রাখার প্রেক্ষাপটে সেদিন সকল মুসলমানদের উচিৎ রোজা রাখা, প্রার্থনা এবং সকল ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিরত থাকা এবং দোকান পাট বন্ধ রাখাও হবে তুর্কীদের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে জোড়ালো প্রতিবাদ।[৪৬] এসব নির্দেশনা ছিল মূলতঃ গান্ধীজির এবং এটাই ছিল তাঁর রাজনীতির ধরণ। খিলাফত আন্দোলনের পশ্চাতে গান্ধীজি ছিলেন সংগঠনীয় প্রতিভা। মুসলমানদেরকে উক্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য আব্দুল বারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত পোস্টার যখন বের হয় তখন বোম্বে থেকে অর্থ ও নির্দেশনা আসতে থাকে। তাৎক্ষণিকভাবে ঐদিন ব্যাপকভাবে সফলতা না আসলেও খিলাফত আন্দোলনের নতুন নির্দেশনা সাংগঠনিকভাবে অগ্রগতি লাভ করে।[৪৭] খিলাফতের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা, আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তিতে তাঁর অবদান এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্য তিনি একজন বিখ্যাত মুসলিম প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত হন। মুসলিম লীগের অধিবেশনে আনসারী ঘোষণা করেন যে, গান্ধীজি তাঁর মহৎ কার্যাবলীর মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের নিকট প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছেন।[৪৮] গান্ধীজি হিন্দুদেরকে খিলাফত আন্দোলনে সম্পৃক্ত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান।[৪৯] আব্দুল বারী গান্ধীজিকে খিলাফত আন্দোলনে আরও নিবিড় ভবে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন। বারী খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীজির সমর্থন আদায়ে গর্ববোধ করে বলেছিলেন যে, "I have made Mahatma Gandhi to follow us in to khilafat question while I have accepted his support in getting our aims fulfilled and for that purpose I think it is necessary to follow his advice." খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীজির সমস্ত আসক্তি আন্দোলনকে আরও সোচ্চার করল।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৯ সালের নভেম্বরের প্রথম দিকে দিল্লীর খিলাফত কমিটি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা ২৩ নভেম্বর দিল্লীতে একটি খিলাফত সম্মেলন আহ্বান করবেন এবং সে সম্মেলনের মাধ্যমে তারা ব্রিটিশ কর্তৃক তুর্কীদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রেক্ষিতে সকল মুসলমানকে প্রতিবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।[৫১] উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৯১৯ সালের ২৩-২৪ নভেম্বর দিল্লীতে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ তারিখের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলার মুসলিম রাজনীতিবিদ এ. কে. ফজলুল হক।[৫২] ঐ সম্মেলনে প্রায় তিনশত প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।[৫৩] তাদের মাঝে অধিকাংশই ছিলেন ইউ. পি-এর খ্যাতনামা মুসলিম নেতৃবর্গ। সম্মেলনে এতই ভারতীয় মুসলমান উপস্থিত ছিলেন যে, পূর্বের আর কোন সম্মেলনে এত বেশী উপস্থিত হয়নি। তাই ইহা ছিল স্মরণ কালের উপস্থিতি।[৫৪] ঐ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীও যোগদান করেন। ঐ সভায় কেবল বিভিন্ন অঞ্চলের খিলাফত কমিটির প্রেরিত প্রতিনিধিদের যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করে তাঁকে যোগদানের সুযোগ দেয় হয় এবং তাঁকে সাদর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সভায় তারযোগে বাণী পাঠান। তা ছিল:-

"পাঞ্জাব যখন অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য আওয়াজ তুলেছে, সেই মূহুর্তে "শান্তি উৎসবের" আনন্দে আমরা যোগ দিতে পারিনা। শান্তি সভা আরোপিত শর্তের কারণে তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে। সুতরাং আমরা শান্তি উৎসবে আনন্দ করতে পারিনা।"[৫৫]

ঐ সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে একটিতে মুসলমানদের প্রতি আবেদন জানানো হয় যেন তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের ১৩ ডিসেম্বরের বিজয় উৎসবে অংশগ্রহণ না করেন। আরেক প্রস্তাবে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তুর্কী সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সরকারের সাথে অসহযোগ নীতি অনুসরণ করে চলার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।[৫৬] সুমিত সরকার বলেন, উপমহাদেশের রাজনীতিতে ওটাই ছিল অসহযোগের সর্বপ্রথম আহ্বান।[৫৭]

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব করেন। সভাটি ছিল হিন্দু-মুসলমানদের সম্মিলিত অনুষ্ঠান। বিভিন্ন স্থানের প্রায় একহাজার প্রতিনিধি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।[৫৮] দ্বিতীয় দিনের ঐ সভায় গান্ধীজি ছাড়াও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পণ্ডিত মদন মোহন

Dhaka University Institutional Repository

মালভীয়া, জওহরলাল নেহেরু সহ কংগ্রেসের বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।[৫৯] সভাপতির ভাষণে গান্ধীজি খিলাফত প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সরকারকে অসহযোগিতা করার ও প্রস্তাব করেন।[৬০] তিনি তাঁর বক্তৃতায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং খিলাফত আন্দোলনে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।[৬১] তিনি সভাপতির ভাষণে আরও বলেন,

> "খিলাফত-সভা শান্তি উৎসবে যোগ দেবেনা বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমার মতে তা সঙ্গত। ভারতের চার আনা অধিবাসীর (মুসলমান) সাথে খিলাফতের সম্পর্ক রয়েছে। ভারতীয় হিসেবে এর সাথে অন্য সকল সম্প্রদায়ের ও সম্বন্ধ আছে। যতদিন খিলাফতের সুব্যবস্থা না হবে, ততদিন ভারতে শান্তি উৎসব হতে পারেনা। বড়লাট বাহাদুরের পক্ষে খিলাফত সমস্যার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত শান্তি উৎসব স্থগিত রাখলেই ভাল হয়। খিলাফতের সুব্যবস্থা না হলে ইংল্যান্ডের পণ্য বর্জন করার যে সিদ্ধান্ত খিলাফত কমিটি গ্রহণ করেছে, তা সমীচীন বলে মনে হয়না। কারণ বর্জনের ব্যাপারটি প্রতিহিংসামূলক।"[৬২]

তিনি আরও বলেন, "If Government should betray us in a great cause like the khilafat we could not do otherwise than non-co-operate." [৬৩] ঐ সভায় তাঁরা খিলাফত প্রশ্ন এবং তুর্কীদের শেষ রক্ষার আলোচনার জন্য ইংল্যান্ডে একটি প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত স্থির করে এবং ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট আন্দোলনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে ছিলেন, সৈয়দ জহুর আহমেদ, হসরত মোহনী, জাফর-উল-মুলক আলভী, মৌলভী আকরাম খান, মৌলভী মুনিরুজ্জামান, আব্দুল্লাহ্ হারমী, হাজী আহাম্মেদ খতরী, মওলানা সানাউল্লাহ্, আপা এম. সফদার, মওলানা আরিফ হাকসী, তাজউদ্দিন এবং মৌলভী মোহাম্মদ সাজ্জাদ।[৬৪] এছাড়াও দিল্লীতে সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খিলাফত আন্দোলনের একটি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়।[৬৫]

তিন চতুর্থাংশের অধিক বোম্বের মুসলমান বণিকগণ যাঁরা ব্রিটিশ দ্রব্যের ব্যবসায় জড়িত ছিলেন, তাঁদের ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনে প্রচুর ক্ষতি হবার পরও তাঁরা খিলাফত আন্দোলনে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন।[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর প্রদেশে খিলাফত আন্দোলনে হিন্দুদের সমর্থন পাওয়ার জন্য আব্দুল বারী, আসফ আলী এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ গোহত্যা নিষেধের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গান্ধীজি তা বাতিল করলেন। তিনি মত প্রকাশ করলেন যে, মুসলমানরা স্ব-ইচ্ছায় গোহত্যা বন্ধ করতে পারেন, ঠিক তেমনি হিন্দুরাও স্ব-ইচ্ছায় খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করতে পারেন।[৬৭]

উত্তর প্রদেশের খেলাফত আন্দোলনকারীরা শান্তি উৎসব বর্জন আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টা ছিল তাঁদের পিছনে হিন্দুদের শোভাযাত্রা বের করা। হিন্দুরা শান্তি উৎসব বর্জন করার জন্য তাঁদের সমর্থন দিয়েছিলেন। ফলে সরকার কর্তৃক উক্ত উৎসব পালনে বিঘ্নিত হয় এবং সারা ভারতে খিলাফত বিষয়টা প্রাধান্য লাভ করে। যা ছিল খিলাফতীদের বড় বিজয়।[৬৮]

সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলনের পরপরই ১৯১৯ সালের ২৫ নভেম্বর দিল্লীতে উলামাদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৬৯] ঐ সভায় বাংলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আকরাম খাঁন। ঐ সমাবেশে অমৃতসরের মওলানা আবুল ওয়াফা সানাউল্লাহর প্রস্তাবক্রমে এবং মওলানা মনিরুজ্জামান এর সমর্থনে আব্দুল বারী সভাপতিত্ব করেন।[৭০] এতে উলামাদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতের মুসলমানদের জাতীয় ও ধর্মীয় সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে গঠন করা হয় সর্বভারতীয় উলামা সংগঠন "জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ"।[৭১] বাংলা থেকে মওলানা আকরাম খান ঐ সংগঠনের সাংবিধানিক কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হন।[৭২] খিলাফত আন্দোলনের পরিবেশেই এ সংগঠনের জন্ম হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আলেমদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় মুসলমানদের জাতীয় ও ধর্মীয় সমস্যাদি নিরসন করা। মওলানা মুফতী কিফায়তুল্লাহ ও মওলানা হাফিজ আহম্মেদ সাঈদ যথাক্রমে উক্ত সংগঠনের সভাপতি ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।[৭৩] উলামাদের সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতির ক্ষেত্রে এ সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার, কংগ্রেসপন্থী এবং গান্ধীজির চিন্তা চেতনা ও কর্মপন্থার অনুসারী এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ সর্বভারতীয় উলামা সংগঠনটি খিলাফত আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে।[৭৪]

১৯১৯ সালের ৬ ডিসেম্বর জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ এর এক বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯১৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১৯২০ সালের ১ জানুয়ারি

Dhaka University Institutional Repository

পর্বত অমৃতস্বরে জমিয়তের প্রথম অধিবেশনে পর্যায়ক্রমে আব্দুল বারী ও মুফতি কিফায়তুল্লাহ সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মসজিদ সমূহে মহানান্য তুর্কী সুলতানের নামে খুৎবা পাঠ করা হোক এবং সন্ধি সম্মেলনে তুরস্ক ও খিলাফত বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য মিঃ ইস্পাহানী, মিঃ গোলাম মুহাম্মদ ভাক্সী এবং মিঃ মুশীর হুসাইন কিদওয়াইকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সহযোগে কাজ করার অনুমতি লাভের জন্য ব্রিটিশ সম্রাটের নিকট এ সভা আবেদন করছে। কারণ তাঁরা আশংকা করছেন যে, খিলাফত প্রশ্নে যদি এমন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ, তাহলে ব্রিটিশ প্রজারা মনক্ষুন্ন হতে পারে, এবং তাঁদের মনে আলোড়ন ও উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।

ঐ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উক্ত সংগঠন অমুসলিম প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করবে, ধর্মীয় স্বার্থসমূহের সংরক্ষণ করে রাজনীতি এবং ধর্মের মাঝে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মুসলমান জনসাধারণকে পথ প্রদর্শন করবে।

১৯১৯ সালের ২৯-৩১ ডিসেম্বর অমৃতস্বরে সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের দ্বাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হাকিম আজমল খাঁন। অধিবেশনে সদ্য কারামুক্ত পাঞ্জাবী নেতা ডঃ সায়ফুদ্দীন কিচলু, মতিলাল নেহেরু, মদন মোহন মালব্য, মিসেস এ্যানি বেসান্ত, মিঃ মহাত্মা গান্ধী, মিঃ শ্রী নিবাস শাস্ত্রী সহ অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন। হাকিম আজমল খাঁন তাঁর সভাপতির ভাষণে, পাঞ্জাবের নৃশংসতা, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, লর্ড হান্টার কমিটি নিয়োগ, ভারতে নতুন শাসন সংস্কার, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, তুর্কী সাম্রাজ্য ও খিলাফতের গুরুত্ব, শান্তি উৎসব বর্জন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অধিবেশনে তুর্কী খলিফার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ভারতীয় পণ্য ব্যবহার ও পূর্ন জবাবদিহী মূলক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী সম্বলিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়। এছাড়াও ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বয়কট সহ সম্ভাব্য সকল প্রকার গঠনতান্ত্রিক আন্দোলন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শেষ প্রস্তাবটি ছিল, Under the circumstances, the Musalmans would be fully justified to carry on all the possible methods of constitutional agitation open to them, including a boycott of the British army, if it is likely to be used outside India for Imperial and anti-Islam purpose.

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে আরম্ভ করে ১৯২০ সালের জানুয়ারির ৬ তারিখ পর্যন্ত অমৃতসরে সর্বভারতীয় কংগ্রেস, সর্বভারতীয় খিলাফত কনফারেন্স, হোমরুল লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন সমূহের ও ঐতিহাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং পাঞ্জাবী নেতাদের মুক্তি লাভের ফলে সারা ভারতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।[৭৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৫ সালের ৩০ মে ভারত সরকার "প্রতিরক্ষা আইন" বলে মওলানা মুহাম্মদ আলী ও তাঁর বড় ভাই মওলানা শওকত আলীকে গ্রেফতার করে। আলী ভ্রাতৃদ্বয় কারাগারে থাকাকালেই ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে খিলাফত কমিটি গঠিত হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর তাঁরা জেল থেকে মুক্তি পান। মওলানা আবুল কালাম আজাদও একই আইন বলে ১৯১৬ সালের এপ্রিলে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তিনিও ১৯২০ সালের ১ জানুয়ারি মুক্তি পান। তখন পর্যন্ত খিলাফত আন্দোলন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা মুক্তি লাভ করে গান্ধীজির সহযোগে খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে প্রথম মহাযুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্য পুরস্কার স্বরূপ "কায়সার-এ-হিন্দ" স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। তিনি দিল্লীর সর্বভারতীয় খিলাফত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে ভারত সরকারের নিকট খিলাফত প্রশ্নের "সমীচীন সুমীমাংসার" দাবী করেছিলেন।[৭৬]

১৯১৯ সালের ডিসেম্বর অমৃতস্বরে গান্ধীজি এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা খিলাফত নেতাদের সাথে মুসলমানদের দুঃখ কষ্ট এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।[৭৭] ২৩ নভেম্বর ১৯১৯ তারিখের দিল্লী অধিবেশনের সিদ্ধান্ত এবং ৩১ ডিসেম্বর অমৃতস্বরের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খিলাফত ও পবিত্রভূমি সম্পর্কে তাঁদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় একদল প্রতিনিধি প্রেরণের অনুমতির জন্য[৭৮] ১৯২০ সালের ১৯ জানুয়ারি মওলানা মুহাম্মদ আলী মতান্তরে ডাঃ আনসারীর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলিম নেতার একটি দল বড়লাট চেমসফোর্ডের সঙ্গে দিল্লীতে দেখা করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারক লিপি প্রস্তুত করেন মওলানা মুহাম্মদ আলী এবং আবুল কালাম আজাদ স্মারক লিপিতে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু তিনি উক্ত প্রতিনিধি দলে যোগদান করেননি।[৭৯] এতে প্রতিনিধি প্রেরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চেমসফোর্ড বললেন যে, খিলাফত তুরস্কের

Dhaka University Institutional Repository

নিজস্ব ব্যাপার। তাছাড়া তিনি তাঁদের পবিত্র স্থান সমূহের দাবীর ব্যাপারে কোন আশান্বিত করতে পারেননি। যুদ্ধপূর্ববর্তী অবস্থায় তুর্কী যেমন সার্বভৌম ছিল তদবস্থায় ফিরে আনার তাঁদের দাবীর ব্যাপারেও তিনি কোন আশা দিতে পারেনি। তাঁর অঙ্গুহাত ছিল যে, মিত্র শক্তির অধিবেশনে এ ধরনের কোন দাবী মানবে না।

ভাইসরয় কর্তৃক কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির অর্থনৈতিক শর্তাদির দাবীও গ্রাহ্য হল না, তথাপি মুসলমানরা নিরাশ হয়নি। ১৯২০ সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা নতুন উদ্যমে আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা দুটি ক্ষেত্র থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন।

প্রথমটি হল:- উন্নত ধরনের উলামা সংগঠন। উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকার পরও বিভিন্ন মতের উলামারা আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরনের লক্ষ্যে তাঁদের ভিতর একতা আনার প্রচেষ্টায় ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে "জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ" প্রতিষ্ঠা করেন। খিলাফত, পবিত্রভূমি এবং মুসলমানদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ফিরিঙ্গীমহল এবং মজলিশ-মুইড-উল-ইসলাম কর্তৃক উত্থাপিত উলামাদের দাবী রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে না এনে বহু সংস্থা এমনকি নেতৃস্থানীয় দেউবন্দী শতস্ফুর্তভাবে এতে যোগদান করেন।[৮০]

দ্বিতীয়টি হল:- বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে যে সব মুসলমান নেতা অন্তরীণ ছিলেন তাঁরা মন্টোগু-চেমসফোর্ডের সংস্কারে রাজকীয় প্রজ্ঞাপনে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করায়[৮১] মুক্তি পেয়ে খেলাফত আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন।

১৯২০ সালের প্রাক্কালে খিলাফত আন্দোলনের নতুন উদ্যমতা তীব্রতা লাভ করে।[৮২] গান্ধীজিও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে এক প্রলয়ঘন আন্দোলনের ডাক দিলেন। যার ফলে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয়।[৮৩] ২০ জানুয়ারি দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সকলেই মুসলমানদের খিলাফত ইস্যুতে সহযোগিতা করবেন বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। লালালাজপত রায় (পাঞ্জাব), বিপিনচন্দ্র পাল (বাংলা) প্রমুখ ঐ ইস্যুতে ঐক্যমত পোষণ করেন। মোট কথায় খিলাফত প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লীতে আরও একটি খিলাফত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় মহাত্মা গান্ধী, মওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, হাকিম আজমল খাঁন, মওলানা আব্দুল বারী যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধী ঐ সময় তাঁর অসহযোগের পূর্ণ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি বললেন, "ডেপুটেশন ও স্মারকলিপির দিন বাসী হয়ে গেছে। আমাদেরকে অবশ্যই গভর্নমেন্টের সাথে সহযোগিতা পরিহার করতে হবে। এটা করতে পারলেই গভর্নমেন্ট আমাদের কথায় আসতে বাধ্য হবেন।" তিনি আরও বলেন যে, সরকার প্রদত্ত খেতাব প্রত্যাখান করতে হবে। কাছারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করতে হবে। সরকারী চাকুরী থেকে ইস্তফা দিতে হবে এবং ব্যবস্থাপক সভায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। গান্ধীজির ঐ কর্মসূচিতে অনেক নেতা ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। হাকিম আজমল খান ঐ কর্মসূচি বিবেচনা করার জন্য সময় চেয়েছিলেন। বারী বললেন, যেহেতু ঐ কর্মসূচি একটি মৌলিক ইস্যু তাই ঐশী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি উত্তর দিতে সক্ষম নন। আলী ভ্রাতৃদ্বয় বারীর মতামতের উপর ছেড়ে দিলেন। আজাদ কোন ইতস্ততা না করেই সমর্থন দেন। তিনি আরও বললেন, জনগণ যদি সত্যিই তুরস্ককে সাহায্য করতে চায়, তাহলে গান্ধীজির কর্মসূচি ছাড়া গত্যন্তর নেই।[৮৪] এ কর্মসূচি ছিল গান্ধীজির ব্যক্তিগত। তবনও তাঁর কর্মসূচি সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক সমর্থিত হয়নি।[৮৫] যদিও জানুয়ারির ৩ তারিখে খিলাফত কেন্দ্রীয় কমিটিতে অসহযোগ আন্দোলন বাস্তাবায়নের প্রস্তাবে গান্ধীজির নিকট তাঁর কর্মসূচি এবং কর্মপন্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তিনি একটি প্রজ্ঞাশীল রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন। তা হল:-

> "If he were allowed to lead the Mohammedans who would then form a small committee of such whole hearted workers who would have to leave themselves at his mercy and who would have to behave in any manner he directed them to do. He would not limit the number but those who joined him whether few or many should be such people who would sacrifice their very lives if he asked for them. He would then get through all the stages in four or five months one by one. [stages of non-co-operation] He would himself he sort of a dictator. The committee would work in

Dhaka University Institutional Repository

the cause of the khilafat but would not be dependent to any other committee. Even the central khilafat committee would not be allowed to guide this committee."

শওকত আলী ঘোষণা দেন যে, মুসলমানরা গান্ধীজির একক নেতৃত্বের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন।[৮৬]

যা হোক, ১৯২০ সালের প্রাক্কালে খিলাফত আন্দোলনকে তীব্র করে তোলার জন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সারা উত্তর ভারতে আন্দোলনের পক্ষে ভ্রমণ শুরু করেন। সর্বত্রই প্রাদেশিক খিলাফত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং আন্দোলনের জন্য আলী ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক তহবিল গঠিত হয়েছিল। তাঁরা খিলাফত আন্দোলনে অসহযোগ আন্দোলনকে সম্পৃক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। ভ্রমণে এবং অধিবেশনে শওকত আলী, আব্দুল বারী ও অন্যান্য নেতৃবর্গ হিন্দুদের সমর্থন আদায়কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বক্তব্য রাখতেন। গান্ধীজিও যোগদান করলেন। তিনি খিলাফত আন্দোলনে হিন্দুদের সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কম ওকালতী করেননি।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ তারিখে কলকাতায় আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে খিলাফত অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকারের নিকট বর্তমান খিলাফতের বিপর্যয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য[৮৭] মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ইউরোপে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হল। ভূপালের ব্যবস্থাপক পরিষদের সেক্রেটারি হাসানা মুহাম্মদ হায়াত ছিলেন ঐ দলের সেক্রেটারি। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন, এলাহাবাদের "Independent" পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ হুসাইন, মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নাদবী ও বর্ধমানের জনাব আবুল কাসেম। মিঃ শুয়াইব কুরায়শী ও মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী তখন অক্সফোর্ড-এ অধ্যয়নরত ছিলেন। তাঁরা সাময়িকভাবে ঐ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কাজ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ শাসন কর্তৃপক্ষ; সভাসদ এবং সম্ভব হলে ভারত শাসকের সঙ্গে দেখা করে খিলাফত সংরক্ষণ সম্পর্কীত ভরতীয় মুসলমানদের অনুভূতি যথাযথ ভবে তুলে ধরবেন। তাঁরা ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে তাঁদের কর্মসূচি সঠিকভাবে সম্পন্ন করেন, বিভিন্ন সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করেন, প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং নেতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৯২০ সালের ২১ মার্চ প্যারিসের এক সভায় মুহম্মদ আলী বললেন, খিলাফতের ব্যাপারটি শুধু তুরস্কের নয়, বরং এ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারটি ভারতীয় মুসলমানদেরও। খিলাফত বিশ্ব মুসলমানদের একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এর সংরক্ষণের জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড এবং সামরিক শক্তির প্রয়োজন। তাই সমগ্র "জাজিরাতুল আরব" অবশ্যই তুরস্কের নিয়ন্ত্রণে থাকার আবশ্যকতা রয়েছে। তিনি বললেন,

> "Ladies and gentlemen, we are here not to present Turkey and the Turks, but to represent ourselves and our country, namely India. ... The khilafat is the most essential institution of the Muslim community throughout the world. A vast majority of the Muslims of the world recognise the sultan of Turkey to be the commander of the faithful, and the successor and khalifa of their prophet. It is an essential part of this doctrine that the khalifa, the commander of the faithful, should have adequate territories, adequate military and naval resources, adequate financial resources."[৮৮]

১৫, ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০ বোম্বেতে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির তৃতীয় অধিবেশনে একটি শক্তিশালী আক্রমণ চালানো হয়েছিল। শওকত আলী, আব্দুল বারী সিন্দদের অনুন্নত মুসলিম প্রদেশগুলোতে ভ্রমণ করেন এবং ধর্ম উন্মাদ সিন্দি পীর এবং মৌলভীদের সহায়তায় অধিবেশনে আক্রমণ করেছিলেন। চৌদ্দটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। একটি ছিল কমিটির তহবিলকে ৩০ লক্ষতে উন্নীত করা।[৮৯] তাঁদের কর্মসূচি গান্ধীজি কর্তৃক তৈরি হয়েছিল। কর্মসূচিতে সরকারকে হুশিয়ার করে বলা হয় যে, তাঁদের দাবী যদি মানা না হয় তাহলে ভারতে শান্তি আশা করা বৃথা। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত কমিটি কর্তৃক গৃহীত হলনা। Subject Committee-তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল এবং একটি সিদ্ধান্ত বিবেচনার জন্য বলা হয়েছিল। যা ছিল, প্রস্তাবিত ইংরেজদের দ্রব্য বর্জন কর্মসূচি ও সরকারকে সহযোগিতা বর্জন। যদি ইহা গৃহীত না হয় তাহলে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে মুসলমানদের যোগদান এবং জাজিরাতুল-আরব প্রশ্নে পশ্চাদাপসরণ করা হারাম হবে। বোম্বের বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধিগণ চূড়ান্ত কর্মসূচি দাবী করলেন। যাদের মধ্যে কিছু ছিল মধ্যপন্থী। যখন অধিবেশনে তৃতীয় বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন অধিবেশনের পরিবেশ আন্দোলনকারীদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মধ্যপন্থীরা মওলানাদের সেনাবাহিনীতে

Dhaka University Institutional Repository

যোগদানের প্রশ্ন তুলে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করেন। আজ্জাদ সোবহানীর সভাপতিত্বে মওলানাদের অধিবেশনে আব্দুল বারী কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যেহেতু মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী লেলিয়ে না দেওয়ার নিশ্চয়তা নেই সেহেতু মুসলমানদের সেনাবাহিনীতে যোগদান হারাম। সৈন্যদের মাঝে ফতোয়া বিতরণের জন্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এতে কেউ কেউ বিরোধীতা করলে তাঁদেরকে বলা হয় যে, সিদ্ধান্ত যা নেওয়া হয়েছে তা শরিয়তের বিধান অনুযায়ীই নেওয়া হয়েছে। যা হোক, চরম আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, তারা বোম্বের মধ্যপন্থীদের সহযোগিতা পাবেনা। তাই তাঁরা ভারগ্রীর প্রস্তাব মেনে নিলেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল যে, ইংল্যান্ডে মুহাম্মদ আলীর প্রতিনিধিত্বের সফলতা যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের সেনাবাহিনীতে যোগদান প্রশ্ন, ইংরেজ দ্রব্য বর্জন এবং সরকারের প্রতি অসহযোগিতার প্রশ্নটি স্থগিত থাকবে। কিন্তু কয়েকদিন পর "কেন্টাবিউরী"র খ্রীষ্টান ধর্মযাজক কর্তৃক তুর্কীদের প্রতি বিরাজমান প্রতিহিংসা ভারতে দারুণভাবে প্রভাবিত হল। বোম্বের প্রখ্যাত অর্থ যোগানদাতারা এবং ইউ. পি. এর খিলাফতীরা মুহাম্মদ আলীর প্রতিনিধিত্বের ফলাফলের অপেক্ষায় রইলেন না।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলা প্রদেশের খিলাফত সম্মেলনে আব্দুল বারী ইংল্যান্ডের গীর্জার প্রধান যাজক এর প্রতি "চোখের বদলে চোখ" এরূপ বদলা নিতে কোনরূপ ছাড় দেননি। তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললেন,[১০]

> They could sacrifice every Christian's life and property; they could burn them and even if they stole their property he would give them a Fatwa in justification. ... He declared that had cannon and guns been at his disposal he would have declared war and would have burnt the Christians after saturating them with kerosene oil....[১১]

ঐ সম্মেলনের সভাপতি আজ্জাদ আন্দোলনের বাস্তব বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং কোরআনের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করে অসহযোগ আন্দোলনকে ইসলামী মতবাদ "টার্ক-ই-মালভট" এ অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। সম্মেলনে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ও

Dhaka University Institutional Repository

সরকারকে সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং ১৯ মার্চ শুক্রবার খিলাফত দিবসটি হরতালের মাধ্যমে পালিত হবার জন্য ঘোষণা করা হয়।[৯২] ৭ মার্চ কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটিতে কিছু ভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও ১৯ মার্চ এর হরতালকে তাঁরা সমর্থন দিয়েছিলেন।[৯৩] ঐ সময় জানা গেল যে, মিত্র শক্তি তুরস্কের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। তখন মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করলেন যে, মিত্র শক্তি যদি তুরস্কের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিবেন।[৯৪]

৯ মার্চ, ১৯২০ তারিখে মহাত্মা গান্ধী তাঁর ১ম অসহযোগ ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়, খিলাফত প্রশ্ন এবং পাঞ্জাব ঘটনাবলীর সুবিচার না হলে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবে।[৯৫] গান্ধীজি ১৬ মার্চ তারিখে রক্তপাত ছাড়া অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি দেন। মওলানা আজাদ কর্তৃক বিবৃতি দেয়া হয় যে, হিন্দুগণও প্যান ইসলামীজমে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করবে, যেখানে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, একজন মুসলমান থাকলেও ভারতের মুসলমানদের যে কোন ক্ষমতার জন্য ভারতীয় হিসেবে আন্দোলন করবেন। আজাদ শরিয়তের বিধান মোতাবেক মতামত দেন যে, যদি ভারত স্বাধীন হয় এবং সরকার যদি এরূপ আইন করে যাতে মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমান অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে, সেরূপ ক্ষেত্রে মুসলমানরা প্রতিরোধ করবে এবং খলিফা তাঁর বাহিনী দ্বারা প্রতিরোধ করবেন।[৯৬]

১৯২০ সালের ২৩ মার্চ মিরাটে জাঁকজমকভাবে খিলাফত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৯৭] ঐ অধিবেশনে উলামাদের নিয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে আন্দোলনকে শক্তিশালীভাবে সংগঠিত করার প্রস্তাব হয়েছিল[৯৮] এবং মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের স্কীম ব্যাখ্যা করে বলেন, "সরকার প্রদত্ত সকল পদবী প্রত্যাখান করতে হবে, সরকারী চাকুরী ছাড়তে হবে, সেনাবাহিনী এবং পুলিশের চাকুরী ছাড়তে হবে, ট্যাক্স ও অন্যান্য সরকারী পাওনা বন্ধ করতে হবে।" এ সভাতেই গান্ধীজি তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এ সম্পর্কে আবুল কালাম আজাদ বলেন,

> "After a few weeks, a khilafat conference was held at Meerut. It was in this conference that Gandhi preached the first time the non-co-operation programme from a public platform. After he

Dhaka University Institutional Repository

has spoken, I followed him and gave him my unqualified support."

কলকাতায় অনুষ্ঠিত খিলাফত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯ মার্চ হরতাল, শোভাযাত্রা, জনসভা, রোজা, দোয়া সহকারে সারা ভারতে দ্বিতীয় খিলাফত দিবস পালিত হয়। এতে মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৯৯] মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীর প্রতি বলেন, খিলাফতের দাবী ব্যর্থ হলে বিপ্লব নেমে আসতে পারে।[১০০] দশদিন পর ইউ পি উলামাদের অধিবেশনে আব্দুল বারী এবং তাঁর শিষ্য আব্দুল মজিদ বোদাউনীকে নিয়ে বোদাউনে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়।[১০১]

১৯২০ সালের ১৭ এপ্রিল মাদ্রাজে শওকত আলীর সভাপতিত্বে খিলাফত অধিবেশন হয়।[১০২] এ সভায় সর্ব প্রথম অসহযোগের পূর্ণ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[১০৩] দশদিন পর বিহারে অনুষ্ঠিত খিলাফত অধিবেশনে শওকত আলী জোড়ালো বক্তব্য রাখেন। এ সমস্ত কার্যাবলী আন্দোলনের পক্ষে প্রস্তুতির জন্য মূল্য দিতে হয়েছিল। মুসলমানদের অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠল।[১০৪] কলকাতার অধিবেশনে আব্দুল বারীর বক্তৃতায় অহিংসা এবং অসহযোগ আন্দোলনের যে কর্মসূচি দেওয়া হয়েছিল তা থেকে উলামাদের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনেকটা সরে গেল।[১০৫]

খিলাফত কার্যকরী কমিটির অধিবেশন চলল। এতে দেশ ত্যাগের জন্য অনুপ্রাণিত করা হল এবং অতিসত্ত্বর "জেহাদ" ঘোষণা না হওয়াতে অনেকেই নিরুৎসাহিত হলেন। অল্প কিছুসংখ্যক ব্যতীত প্রতিনিধিদের অধিকাংশই গান্ধীজির শান্তিপূর্ণ নির্দেশ মানতে রাজী হলেন না।[১০৬] বোম্বের উদারপন্থীদের প্রতি নিষ্ঠুরভাবে চাপপ্রয়োগ করা হয়েছিল এবং আব্দুল বারীকেও দোষারূপ করা হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। মে মাসের প্রথম দিকে ইউ. পি-এর বিভিন্ন জেলার মুসলমানরা স্বেচ্ছায় অসহযোগ শুরু করলেন। ইউ. পি-এর মুসলিম আন্দোলনকারীরা স্থানীয় উলামাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে অসুবিধায় পড়ে গেলেন।[১০৭] ইউ. পি নেতাদের পক্ষে স্থানীয় উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন ছিল বলে তাঁদের জন্য কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটিতে অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে আলোচনা করতেও অসুবিধা হল। ফলে

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর ভারতে ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের চরম অগ্রগতির ফলশ্রুতিতে বোম্বের মধ্যপন্থীদের সজাগ করে তুলল।[১০৮]

১৯২০ সালের ১১ মে মিত্রশক্তি প্রণীত তুরস্ক শান্তিচুক্তি নামা প্যারিসে তুর্কী ডেলিগেটদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ১২ মে বোম্বে সর্বভারতীয় খিলাফত অধিবেশনে গান্ধীজির অসহযোগ সংক্রান্ত ব্যক্তিগত কর্মসূচি গৃহীত হয়।

১৯২০ সালের ১৪ মে তুরস্কের সাথে মিত্রপক্ষের সম্পাদিত শান্তি চুক্তির (সেভার চুক্তি) শর্তাবলী প্রকাশিত হল।[১০৯] তুরস্কের সাথে জাজিরাতুল প্রশ্নে ভারতের মুসলমানদের দাবী অগ্রাহ্য হল। চুক্তির শর্তানুসারে বিশাল অটোমান সাম্রাজ্য হতে এশিয়া মাইনর, পবিত্র স্থানসমূহ, কনস্টান্টিনোপল বিচ্ছিন্ন করা হল। তার প্রতিরোধের ক্ষমতা খর্বকরে অপমান স্বরূপ তাকে ৫০,০০০ পুলিশ, ৭ টি ক্ষুদ্র জাহাজ এবং ছয়টি যুদ্ধের নৌকা রাখার অনুমতি দেওয়া হল।[১১০] প্রায় একই সময়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা কান্ডের কারণ অনুসন্ধানের জন্য স্কটিশ বিচারপতি লর্ড হান্টারের সভাপতিত্বে নিযুক্ত কমিশনও এর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ফলে দেশবাসীর মাঝে সরকার বিরোধী মনোভাব চরমে উঠে।[১১১]

১৯২০ সালের ২৮ মে খিলাফত কমিটির উদ্যোগে এস. এম. ছোটানীর সভাপতিত্বে বোম্বে শহরে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মুসলমানদের অসহযোগ আন্দোলন ছাড়া আর কোন গতি নেই। তাই প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সভাপতি এস. এম. ছোটানী, দিল্লীর হাকিম আজমল খাঁন, মাদ্রাজের ইয়াকুব হুসাইন, এলাহাবাদের মওলানা ফাখির ও অন্যান্য খিলাফত নেতা ব্রিটিশ প্রদত্ত খেতাব প্রত্যাখান করেন। সারা ভারতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেভ্রে চুক্তি সংশোধনের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়।[১১২]

গান্ধীজি মুসলমানদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে খিলাফত আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।[১১৩] খিলাফত নেতারা উক্ত আন্দোলনে হিন্দুদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেন। কারণ তাঁরা ভাবলেন, হিন্দুদের সহযোগিতা ছাড়া আন্দোলন জোড়ালো করা সম্ভব নয়। তাঁদের প্রচেষ্টায় হিন্দুরা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবিত হন। যদিও হিন্দুদের সমর্থন পেয়েছিল গান্ধীজির কারণে। তাই ১৯২০ সালের জুন মাসে গান্ধীজি নেতৃত্বের শীর্ষভাগে চলে আসেন।[১১৪]

১৯২০ সালের ১-২ জুন এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক ঐতিহাসিক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।[১১৫] সভায় হসরত মোহনী ভারত থেকে ইংরেজদের তাড়ানোর জন্য যে কোন আফগান সেনাবাহিনীতে যোগদান করার প্রতিজ্ঞা করলেন। হিন্দুরা তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা চাইলেন। তখন শওকত আলী ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন যে, তাদের পবিত্র ভূমিগুলো ইতিমধ্যে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এ লক্ষ্যে যে, তাঁরা ইসলামকে বিলুপ্ত করে কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখবেনা। যদি কোন মুসলমান আক্রমণকারী খিলাফতের কারণে এবং ব্রিটিশদের শাস্তি দেওয়ার সমর্থন আদায়ের জন্য আসতো তাহলে অন্যান্য মুসলমানরা তাঁর সাথে হাত মেলাতো। তিনি আরও বললেন, ইসলামের প্রতি উদ্ধত আচরণ এবং অবিচারের জন্য ব্রিটিশরা শাস্তি পাবার যোগ্য।[১১৬] এ কথাগুলো বলে তিনি তাঁর আসনে বসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।[১১৭] আজাদ সোবহানী এবং জাফর আলী খাঁন জোড়ালোভাবে তাঁর কথা সমর্থন করেন।[১১৮]

এ. কে. আজাদ, বিহারের আহাম্মদ হাসান দারাবী, মুহাম্মদ আলী, এইচ. এস. খাম্রী, শওকত আলী, সাইফুদ্দিন কিচলু এবং হসরত মোহানী গান্ধীজিকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করেন যা কারও নিকট এমনকি কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির কাছেও জবাব দিহি করতে বাধ্য নয় এবং কোন প্রকার বিলম্ব ছাড়াই অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করলেন।[১১৯] কর্মসূচি ছিল চারটি:-

১. সম্মানিত পদবী প্রত্যাখান,

২. সরকারের সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ,

৩. পুলিশ ও সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ,

৪. কর প্রদান স্থগিত।[১২০]

সভায় প্রথমে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মুসলমানদের দাবী অনুসারে সেভরে চুক্তির সংশোধন করার জন্য ভাইসরয়কে এক মাসের নোটিশ দেওয়া হোক। এবং খিলাফত প্রশ্নের সুরাহা না হলে ১ আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হোক।[১২১]

Dhaka University Institutional Repository

৩ জুন ১৯২০ তারিখে সকালে এলাহাবাদের The Independent পত্রিকার পাঠকদের শতর্ক করল যে, "Take great care that the control of the Khilafat Movement does not fall entirely into the hands of theologians and divines, without any appreciation of the great national and international issues involved in it."[১২২]

গান্ধীজির নির্দেশনা ভাইসরয়ের নিকট একাধিকবার জোড়ালো আবেদন করা হয়।[১২৩] সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯০ জন মুসলিম নেতা স্বাক্ষরিত একটি স্মারক লিপি প্রস্তুত করা হয়। মওলানা মাযহারুল হক, মৌলভী ইয়াকুব হাসান, মওলানা শওকত আলী ও মওলানা আবুল কালাম আজাদকে নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল ২২ জুন ভাইসরয়ের নিকট স্মারক লিপি হস্তান্তর করে[১২৪] বলেন যে, তুর্কী শান্তি উৎসব পূর্নবিবেচনা করতে হবে অথবা বাদ দিতে হবে। তাঁরা তাঁকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১ আগস্ট পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন[১২৫] এবং তাঁকে এক মাসের যে নোটিশটি দেওয়া হয়, তার মর্ম ছিল যে,

"খিলাফতের ব্যাপারটি মুসলমানদের একটি ধর্মীয় বিষয়। আপনি হোম গভর্নমেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করুন, যাতে তাঁরা তুরস্ক সন্ধিচুক্তিটিকে সংশোধন পূর্বক আমাদের দাবী মোতাবেক করে দেন। তা না হয় আমরা ১ আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলন করতে বাধ্য হবো।"

অনুরূপভাবে মহাত্মা গান্ধীও সন্ধি চুক্তির নিন্দা করে ২৪ জুন ভাইসরয়কে পত্রযোগে এমর্মে এক মাসের নোটিশ দেন যে,

> "লন্ডনে থাকাকালে আমি বিশ্বযুদ্ধের সময় ইন্ডিয়ান ভলান্টিয়ার এম্বুলেন্স কোর ইত্যাদিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে লোক ভর্তি করিয়েছি। আমরা গোড়া থেকেই ব্রিটেনের বিশ্বস্ত প্রজা ছিলাম। আপনাকে অনুরোধ করছি মুসলমানদের দাবী অনুসারে খিলাফত প্রশ্নের সমাধান করেদিন। এখনো সময় আছে। তা না হয় সর্ব প্রথম আমাকেই বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঠাতে হবে। আমি মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য কেবল তিনটি পথই খোলা আছে। সশস্ত্র যুদ্ধ, হিজরত ও অসহযোগ আন্দোলন।"

Dhaka University Institutional Repository

এ নোটিশগুলো ছিল রাজভক্ত ভারতীয় প্রজাদের দিক থেকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সর্বপ্রথম আল্টিমেটাম।[১২৬] কিন্তু খিলাফত আন্দোলনের উদ্যোক্তরা মওলানা মুহাম্মদ আলী এবং মওলানা শওকত আলীর নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগের প্রস্তাব পূর্বেই গ্রহণ করেছিলেন।[১২৭]

৮ জুলাই ১৯২০ তারিখে করাচীতে সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলনে ভারতীয় সেনাবাহিনী হতে মুসলমান সৈন্যদেরকে চাকুরী পরিত্যাগ করার জন্য বলা হয় কারণ ইহা ছিল ধর্মীয় পরিপন্থী।[১২৮] এটা ছিল প্রকাশ্য রাজদ্রোহ। আলী ভ্রাতৃদ্বয় এর আগেই রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে অন্তরীণ জীবন যাপন করেছিলেন। গান্ধীজির উদ্দেশ্য ছিল, খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁর বৃহত্তর অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানদের সহযোগিতা লাভ করা। কিন্তু হিন্দু সাধারণ এবং বেশীর ভাগ নেতৃস্থানীয় হিন্দু খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। কংগ্রেসীরা কিন্তু তখন পর্যন্তও স্বাধীনতা কি পদার্থ তা চিন্তা করতে ভরসা করতেন না। তাই বিমলানন্দ বাবু বলেছেন,

"কংগ্রেসের নেতারা প্রায় এক বাক্যে বললেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস পূর্ন স্বাধীনতার চেয়ে ভাল; কিন্তু খিলাফতের মুসলমান নেতারা বললেন, পূর্ন স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।"

গান্ধীজির রাজনৈতিক উন্নতির মূলে ছিল মুসলমানদের উদার আগ্রহ। তাঁরাই তাঁকে "মহাত্মা" উপাধি দিয়ে সারা ভারতে প্রদর্শন ও উপস্থিত করে তাঁদের মন প্রিয় করে তুলেছিলেন।[১২৯] সেনাবাহিনী হতে মুসলমান সৈন্যদেরকে চাকুরী হতে পদত্যাগের ব্যাপারে গান্ধীজি এরূপ সমর্থন করেন যে, সরকারের অধীনে সেনাবাহিনীতে যোগদান করা যে কোন ভারতীয় এর পক্ষে আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।[১৩০]

যা হোক এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯২০ সালের ১ আগস্ট হরতাল সহ তৃতীয় খিলাফত দিবস পালিত হয়। গান্ধীজি তৃতীয় খিলাফত দিবসে ব্রিটিশ সরকারের দেয়া পদক ও উপাধি প্রত্যাখান করেন। ঐ দিন তিনি ভাইসরয়কে এক পত্রে লিখেছিলেন,

"আমাদের ভারতীয় মুসলমান ভাইদের ধর্মীয় অনুভূতি যখন আঘাতপ্রাপ্ত, নির্যাতিত, তখন আমি ব্রিটিশ প্রদত্ত পদক ও উপাধি কি করে ব্যবহার করতে পারি। আমি ব্রিটিশদের

Dhaka University Institutional Repository

অনুগত নাগরিক হিসেবে থাকার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি আর অনুগত থাকতে পারিনা।" [১৩১]

গান্ধীজি তাঁর পত্রে মুসলমানদের খিলাফতের প্রতি ব্রিটিশের অবজ্ঞার কারণে সরকার কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত "কাইসার-ই-হিন্দ" স্বর্ণপদক ফেরৎ দিবেন বলেও জানালেন।[১৩২] মিসেস সরলাদেবী এবং অনেক অসহযোগ নেতা ভাইসরয়কে পত্র লিখে সরকার প্রদত্ত উপাধি প্রত্যাখান করেন।[১৩৩] কিছু সংখ্যক আইনজীবী তাঁদের আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করলেন এবং কিছু খেতাব প্রাপ্ত লোক তাঁদের খেতাব প্রত্যাখান করলেন।[১৩৪] এরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের সাথে খিলাফত নেতারা হাত মেলায়। গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি এক সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে এবং সমগ্র দেশবাসী তাতে সাড়া দেয়।[১৩৫]

মুসলমানদের মধ্যে এক প্রভাবশালী মহল খিলাফত আন্দোলনের প্রতি খুবই জোড়ালো ছিল বলেই উদারপন্থী হিন্দুরাও মুসলমানদেরকে আন্দোলনে সহযোগিতা করেছিলেন। তাই সমগ্র বাংলার মোট জনসংখ্যার ৫২.৮% মুসলমানদের রাজনৈতিক মুখপাত্র মুসলিম লীগের পূর্ণ অগ্রগতি ১৯২০ সাল পর্যন্ত হতে পারেনি।[১৩৬]

১৯২০ সালের ১০ আগস্ট তুরস্কের মিত্র শক্তির স্থায়ী "সেভরে চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয়। তুরস্কের সুলতান আব্দুল ওহিদ খান কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি দলের এ চুক্তি ছিল তুরস্কের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। চুক্তির শর্তানুসারে মিশর, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপোলিটানিয়া, মরক্কো ও তিউনিসিয়া সহ প্রভৃতি স্থানের উপর অধিকার ত্যাগ করতে তুরস্ক বাধ্য হলো। এছাড়া আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ার উপর থেকেও তুরস্কের অধিকার বিলুপ্ত হলে। স্মার্না ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া মাইনরকে সাময়িকভাবে গ্রীসের অধীনে দেয়া হলো। ইজিয়ান সাগরস্থ কয়েকটি দ্বীপ এবং থ্রেসের একাংশ দেয়া হলো ইটালিকে। তুরস্ক আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা মানতে বাধ্য হলো। দার্দানেলিস এবং বোসফোরাস প্রণালীদ্বয় আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ জলপথ বলে ঘোষিত হলো। এক সময়কার বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্য কনস্টান্টিনোপল এবং আনাতোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হল।[১৩৭]

তুরস্ক মিত্রপক্ষের সাথে এ অপমানজনক সেভার্স চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে খিলাফতের অস্তিত্বের বিপর্যয় ঘটে। ফলে ভারতে মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ আরও চরম

Dhaka University Institutional Repository

আকার ধারণ করে এবং এর প্রতিবাদে ৩১ আগস্ট সারা ভারতে আরও একটি খিলাফত দিবস পালন করা হয়।[১৩৮] কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি জোড়ালো ভাবে সমর্থন করে এবং ১৯২০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় জমিয়াত-এ-উলামা-এ-হিন্দ এর বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। ঐ অধিবেশনে মুসলমানদেরকে নির্বাচন, সরকারী বিদ্যালয় এবং কলেজ, আইন-আদালত, খেতাব, সরকারের দেয়া পদবী পরিত্যাগ করার আহ্বান করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে প্রায় ৯০০ উলামা স্বাক্ষর করেন।[১৩৯]

এক পর্যায়ে পুলিশ ব্যারাক থেকে খবর আসে যে, সমগ্র সশস্ত্র পুলিশ, তাঁদের সুবেদার এবং হাবিলদারগণ একযোগে পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁদের অস্ত্র ও পোশাক পুলিশ সুপারের নিকট জমা দিয়েছেন।[১৪০] DIG মিঃ লোম্যান (IB, CID) পরদিন আসলেন।[১৪১] তিনি অনেক পিড়াপিড়ি করেও সফল হতে পারেনি। তারপর তিনি পদত্যাগকারীদের দাফতরিক ছুটি মঞ্জুর করেন এবং তিনি তাঁদেরকে বাড়ি চলে যাবার পরামর্শ দেন। একমাত্র বিহারের জনৈক মুসলিম হাবিলদার ব্যতীত অন্যসবাই চলে গেলেন এবং চারজন কংগ্রেস কার্যালয়ে এসে আন্দোলনে যোগদান করেন। সশস্ত্র সদস্যদের জন্য তাঁদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি এ ধরনের অবজ্ঞা করা একেবারে তুচ্ছ বিষয় ছিলনা। এছাড়াও তারা তাঁদের জীবন এবং সহায় সম্পত্তি বাজি রেখে দেশাত্ববোধক মনোভাব নিয়ে তাঁরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এজন্য দীর্ঘদিন তাঁদেরকে কারাবরণ করতে হয়েছে।[১৪২]

এলাহাবাদের সর্বদলীয় সম্মেলনে (২ জুন, ১৯২০) মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের কর্মসূচি গৃহীত হবার পর থেকেই[১৪৩] গান্ধীজি এবং খিলাফতের নেতারা তাঁদের সমর্থকদের কলকাতা যাবার জন্য এবং অসহযোগ আন্দোলনে সমর্থন দিতে বোঝানোর জন্য সরাসরি আহ্বান করলেন।[১৪৪] গান্ধীজি তাঁর মারওয়ারী অনুসারীদেরকে গোহত্যা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত পরিহার করে খিলাফত নেতাদের সাথে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করলেন।[১৪৫] আব্দুল বারী, হাকিম আজমল খান, আজাদ এবং কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি মুসলমানদিগকে ইদুল আজহাতে গোহত্যা বন্ধ রাখার ইস্যু তৈরি করে বিবৃতি দিয়েছিলেন যা কিছুদিন আগেও কংগ্রেসে উক্ত ইস্যু উত্থাপন করা হয়েছিল। মুসলমানদের প্রতি এ ধরনের নির্দেশ ছিল প্রকৃত পক্ষে আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন আদায় করা। জুলাইয়ে গান্ধীজি এবং শওকত আলী পাঞ্জাব ও

Dhaka University Institutional Repository

সিন্দুতে এবং আগস্টে বোম্বে ও মাদ্রাজের মুসলিম অঞ্চলগুলোতে সফর করেন। তাঁরা মূলত মুসলমানদেরকে অসহযোগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন এবং গুরুত্ব আরোপ করেন যে, এটা একমাত্র খিলাফত সমস্যার জন্যই করা হচ্ছে। তাঁরা সকল জায়গায় অসহযোগের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। বাংলার খিলাফত কমিটি মুসলমানদিগকে বিপুল সমারোহে কলকাতায় যেতে বললেন এবং তাঁদের যেতে উৎসাহিত করার জন্য বিনামূল্যে যাতায়াত এবং থাকার সুবিধা দেবার কথা বললেন।[১৪৬] ইউপিতে নেতৃস্থানীয় উলামারা প্রাদেশিক খিলাফত কমিটিতে একটি প্রচার উপকমিটি গঠন করলেন এবং প্রদেশে সফর করলেন। এসবের প্রস্তুতি কলকাতাতেই প্রকাশিত হল।[১৪৭]

এছাড়াও গান্ধীজি তাঁর অসহযোগ কর্মসূচি কংগ্রেসের সাধারণ সভায় অনুমোদন করার চেষ্টা করেন। ৪-৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁর অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থিত হয়। ঐ অধিবেশনে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাঁচ হাজার ডেলিগেট যোগ দেন। অধিবেশনে প্রায় এক লক্ষ্য লোকের সমাগম হয়। পাঞ্জাবী নেতা লালালাজপত রায়ের সভাপতিত্বে ঐ সভায় গান্ধীজি নিজেই অসহযোগের প্রস্তাব পেশ করেন। গান্ধীজি তাঁর বক্তৃতায় বলেন,

"আমরা যদি স্বরাজ চাই এবং সন্তোষজনক ভাবে খিলাফত সমস্যার সুরাহা করতে চাই, তবে অসহযোগের কর্মসূচি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।"

সভায় উপস্থিতদের মধ্যে মি. সি. আর. দাসের ব্যক্তিত্ব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লালালাজপত ও সি. আর. দাস গান্ধীজির কর্মসূচির সাথে একমত হতে পারেনি। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর জোড়ালো বক্তৃতায় বলেন,

"ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাথে যুদ্ধ করার সর্বোত্তম অস্ত্র হলো ব্রিটিশের মাল বয়কট করা।"[১৪৮]

বাংলা ও মাদ্রাজের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধির সাথে মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ অহিংস অসহযোগ সম্পর্কিত কংগ্রেসের মূল প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে গিয়ে বার বার বাধাগ্রস্থ হয়েছিলেন।[১৪৯] একমাত্র জিন্নাহই গান্ধীজির প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন,

Dhaka University Institutional Repository

অসহযোগ হিংস হোক বা অহিংস হোক, তা হবে ভারতের পক্ষে আত্মঘাতী। এ প্রস্তাবটি তিনি কিছুতেই মানতে পারলেন না।[১৫০]

প্রকৃত দ্বন্দ্বটা ছিল কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির উপকমিটি কর্তৃক অসহযোগ কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছিল সাবজেক্ট কমিটির ভিতর।[১৫১] সাবজেক্ট কমিটির তিনশ সদস্য বৌবাজারের সম্মেলন কক্ষে একত্রিত হলেন। গান্ধীজি, শওকত আলী, ইয়াকুব হাসান, সাইফুদ্দিন কিচলু এবং জীতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী যাঁরা ছিলেন অসহযোগের একনিষ্ঠ সমর্থক; সি. আর. দাস, বি.সি. পাল এবং মদন মোহন যাঁরা ছিলেন আংশিক সমর্থক; জিন্নাহ, মিসেস বিসেন্ট এবং জমনাদাস, দরকাদাস ছিলেন তীব্র বিরোধী। প্রকৃত দ্বন্দ্বটা ছিল গান্ধীজি এবং দাসের মধ্যে। অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজি কর্তৃক প্রদত্ত কর্মসূচি হল:-

১. খেতাব ও পদবী বর্জন,

২. সরকার কর্তৃক আহুত সভা ও দরবার বর্জন,

৩. সরকারী স্কুল থেকে ছেলে-মেয়েদের প্রত্যাহার,

৪. আইনজীবী এবং মোকদ্দমাকারীদের দ্বারা ব্রিটিশ আদালত বর্জন,

৫. মেসোপটেমিয়ায় কর্মরতদের কর্মবর্জন,

৬. কাউন্সিল নির্বাচন প্রত্যাহার ও

৭. বিদেশী পণ্য বর্জন।

১৯২০ এর ৭ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে ঘোষিত সরকারী ঋণ বর্জন, আর্মি এবং পুলিশ বাহিনীতে যোগদান বর্জন কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হল। দাস এবং তাঁর দল ৩, ৪ এবং ৬ নং কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য কর্মসূচিগুলো মেনে নিতে রাজী হলেন। যা অসহযোগ নীতির সমর্থনে কর্মসূচি ছোট করা হলো। কিন্তু গান্ধীজি তাঁর কর্মসূচি কাটছাট করার বিপক্ষে দৃঢ় ভূমিকা নেন। তিন দিনব্যাপী শ্বাসরুদ্ধকর উত্তপ্ত আলোচনা হলো। কংগ্রেসের একটি সভা বাতিল হলো। গান্ধীজি ৩ ও ৪ নং কর্মসূচির বিকল্প কর্মসূচি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যখন একাধিক বিতর্ক উত্থাপিত হলো তখন তিনি তাঁর বিরোধিদের থামিয়ে দিলেন এ মর্মে যে, তাঁরা যা খুশী করতে পারেন। কিন্তু তিনি অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। শওকত আলী ছিলেন গান্ধীজির কট্টর সমর্থক। ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ গান্ধীজির উক্ত সিদ্ধান্ত ১৪৮/১৩৩ ভোটে পাশ

Dhaka University Institutional Repository

হলো। সভা চলতে ছিল। শওকত আলী জানালার কাছে লাফ দিয়ে চিৎকার করে বললেন, "গান্ধীজি কি জয়।" সেদিন সন্ধ্যায় কংগ্রেসেও ১৮৮৫/৮৮৩ ভোটে উক্ত সিদ্ধান্ত পাশ হলো।[১৫২]

এতদিন মহাত্মা গান্ধী নিজের ব্যক্তি প্রভাবে খিলাফত কমিটির পৃষ্টপোষকরূপে নেতৃত্ব দিতেন। এখন থেকে তিনি খিলাফত নেতা ও কংগ্রেসের অসহযোগী নেতা – উভয় অধিকারে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন।[১৫৩]

১৯২০ সালের ৪ অক্টোবর মওলানা মুহাম্মদ আলী তাঁর প্রতিনিধি দল নিয়ে লন্ডন থেকে বিফল হয়ে ফিরে আসেন।[১৫৪] ইউরোপ থেকে নিরাশ ও মনক্ষুন্ন হয়ে ফিরে এসে তিনি আগের চাইতে আরও ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে উঠেন। তিনি আলীগড় কলেজকে সরকারী সাহায্য বিহীন এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কারণ আলীগড়ের মুসলমান ছাত্ররা সরকারী চাকুরীর জন্য আশান্বিত ছিলেন। তিনি ছাত্রদের অনেকটা প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁর কথায় সায় দেয়নি। তিনি কলেজের ডঃ জিয়াউদ্দিন গ্রুপের সাথে পেরে উঠতে পারেননি। গান্ধীজি তখন আলীগড়েই ছিলেন। তিনি ছাত্রদের কলেজ ত্যাগের পরামর্শ দেন। ছাত্ররা হরতাল পালন করেন এবং কলেজ এক মাস বন্ধ থাকে। বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রিন্স ওয়েলসকে এমন সময় স্বাগত জানিয়েছিল এবং ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছিল যখন গান্ধীজির আহ্বানে সারা ভারতে তাঁকে হরতাল ও কাল পতাকা দিয়ে অভিবাদন জানাচ্ছিলেন। মুহাম্মদ আলী কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে তাঁর সহযোগী ডাঃ আনসারী ও হাকিম আজমল খাঁনকে নিয়ে কলেজের কোর্টসভায় বক্তৃতা করেন। কর্তৃপক্ষকে সরকারের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে কলেজটিকে জাতীয় কলেজে পরিণত করার অনুরোধ করেন। তারপর তিনি কলেজের ছাত্র ইউনিয়নে মনমাতানো বক্তৃতা করেন। কলেজ ইউনিয়নের ভাইসপ্রেসিডেন্ট জাকির হোসেন (পরবর্তী সময়ে জামিয়া-ই-মিল্লিয়ার অধ্যক্ষ ও ভারতের প্রেসিডেন্ট) এতে প্রভাবিত হন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় মুহাম্মদ আলীর সাথে ঐক্যমত পোষন করেন। মুহাম্মদ আলী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আলী গড়ের "ওল্ড বয়েজ লজ" এ গিয়ে উঠলেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তা সহ্য করতে না পেরে তাঁদেরকে বার বার লজ ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃপক্ষ বিফল হয়ে পুলিশের সাহায্যে তাঁদেরকে এলাকা থেকে বের করে দেন। তখন মুহাম্মদ আলী এবং তাঁর সঙ্গীরা কলেজের অনতিদূরে ছাউনি করে অবস্থান নেন। মুহাম্মদ আলী অক্টোবরে সেখানে "জামিয়া-ই-মিল্লিয়ার" ভিত্তি স্থাপন করেন।[১৫৫]

উত্তর প্রদেশের রাফি আহাম্মেদ কিদায়ী, মিয়া ইব্রাহীম, প্রফেসর মুজিব, আনছার হারভানী প্রমুখ আন্দোলন পরিচালনার কাজে এগিয়ে আসেন। আলীগড় কলেজের আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ১৩০ জনেরও অধিক ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনে যোগ দেন এবং কলেজ ত্যাগ করেন। ব্রিটিশ এবং বস্ত্রবাদ বিরোধী জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "জামিয়া মিল্লিয়া" প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন আরোও জোড়দার হয়। জামিয়া মিল্লিয়ার প্রথম অধ্যক্ষ জাকির হোসেনের মত পণ্ডিত ব্যক্তিরাও আন্দোলনের পক্ষে তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। ডঃ জাকির হোসেন কারাবন্দি হয়েছিলেন। তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি অভিযান চালাতে পিছুপা হননি। উত্তর প্রদেশের আলীগড়ের টি.এ.কে. শেরওয়ানীর ভাই এন. এ. শেরওয়ানী প্রথম সরকারী চাকুরীচ্যুত হন। কংগ্রেস ও খিলাফতীরা গ্রামে-গঞ্জে সমান্তরাল ভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যান। হিন্দু-মুসলমানদের বিষয়গুলো একটা সমঝোতার মাধ্যমে ফয়সালা করা হয়েছিল। বিহারের একজন ব্যারিস্টার নেতা মাজহারুল হক খুবই রাজকীয় এবং সুসজ্জিত ব্যক্তি হিসেবে ভারতে খ্যাত ছিলেন, যিনি বস্তিতে অবস্থান নেন। উক্ত পরিত্যাক্ত বস্তিটি পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় কর্মকাণ্ডের এক ঐতিহাসিক কেন্দ্রস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ডঃ সৈয়দ মাহমুদ শাফি দেওদী, আব্দুল কাদের প্রমুখ শত শত সভার আয়োজন করেছিলেন এবং কারাবরণও করেছিলেন।[১৫৬]

খিলাফত আন্দোলনের সময় মুসলিম ধর্মীয় নেতারা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন।[১৫৭] তাঁদের ধর্মীয় মনোভাব এরূপ ছিল যে, ইংরেজ সরকার ইসলামের ক্ষতি এবং খিলাফতের পবিত্রতা নষ্ট করেছে।[১৫৮] কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অনুগত মুসলিম লীগের রাজনীতি তাঁদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাঁরা বরং উনিশ শতকের ওহাবীদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্যের সুত্র ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে পড়েন।[১৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে ভারতের মুসলমানরা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিন্দুদের সহায়তা কামনা করেন। কংগ্রেসের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানদের সম্মিলিত সভা হতে থাকে।[১৬০] মুসলিম লীগ এবং মুসলিম রাজনীতির দৃশ্যপট নিখিল ভারত খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। হিন্দুরাও এতে অবদান রাখতে থাকেন। ফলে মুসলিম রাজনীতি অপ্রত্যাশিত এবং অসাধারণ ভাবে উন্নত হতে থাকে। বিশেষ করে খিলাফত কর্মসূচির কারণেই ইহা হতে থাকে।[১৬১] মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মিলিত হয়ে এক অভূতপূর্ব এবং ব্যাপক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়।[১৬২]

খিলাফত আন্দোলন মালাবার পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মালাবারে খিলাফত আন্দোলন যখন চরমে উঠে তখন জনরোষও চরমে উঠে। ১৯২০ সালে মেনজুড়িতে খিলাফতের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল। মালাবারের চার তৃতীয়াংশ মুসলমান কর্তৃক গঠিত কৃষক আন্দোলন যখন অগ্রগতির দিকে তখন মালাবারের খিলাফত আন্দোলন তাঁদেরকে প্রজা আন্দোলনে পরিণত করার জন্য প্রভাব বিস্তার করে। উভয় দলের নেতৃবৃন্দ হাতে হাত রেখে এরনাড এবং ভেলাভেনাড জেলা সমূহে এবং কেলিকার্ট, তিরুরানগাজী, কনডোটি, মেনজোরি, মেলাপুরান ও অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন সভা করেন।[১৬৩]

খিলাফত আন্দোলনের ঢেউ সারা ভারতকে যখন প্লাবিত করেছে তখন খিলাফত আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা এ আন্দোলনকে আরও সক্রিয় করে তোলেন।[১৬৪] গান্ধীজি উলামাদের আন্দোলনকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে মুসলিম রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষদের প্রভাব হ্রাস পেয়ে খিলাফত আন্দোলন আরও চাঙ্গা হয়ে উঠে।[১৬৫] খিলাফত আন্দোলন এক প্রকার ধর্ম যুদ্ধে রূপ নিল এবং উলামারা যতই এ আন্দোলনে সক্রিয় হলেন ততই তা আরও জোড়দার হলো।[১৬৬]

গান্ধীজির অসহযোগ কর্মসূচির কারণে তিনি কংগ্রেস নেতাদের অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে খিলাফত সংগঠনে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলেন বলে এটা ছিল তাঁর বড় বিজয়। তাই এটা খিলাফতীদের জন্যও ছিল একটা বিজয়। যদিও পূর্বে খিলাফতীরা কংগ্রেস এবং হিন্দুদের সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। খিলাফতীদের এ বিজয়ে মূলত প্রাথমিক ভাবে কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন ইয়ংপার্টির লোকেরা এবং ইউ পি এর উলামারা। তারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আন্দোলনকে মূল পথে ধাবিত করেছেন।[১৬৭]

হসরত মোহানী, মশির হোসেন কিদুয়ানীদের সাথে সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও ইসমাইল খান সম্পৃক্ত হয়ে ইউ পি খেলাফত কমিটিকে অগ্রসর করতে থাকে এবং তাঁরা অন্যান্য প্রদেশের কিচলু, জাফর আলী খাঁন, মাজাহারুল হক ইয়াকুব হাসানের সাথে আন্দোলনের পক্ষে হাত মিলালেন। তাঁদের মাঝে প্রধান শওকত আলী বিরামহীনভাবে আন্দোলনের পক্ষে সফর করেন। তিনি ছিলেন অনলবর্ষী বক্তা এবং কমিটির প্রধান ও তিনি বিরোধিদের অতিকৌশলে শক্তভাবে দমন করতে পারতেন।[১৬৮]

যা হোক, খিলাফতীদের বিজয়টা ছিল উলামাদের। ইয়ং পার্টির লোকেরা যা করতে চেয়েছিলেন উলামারা তার চেয়েও দ্রুত গতিতে আন্দোলনকে একটি পর্যায়ে নিতে চেয়েছিলেন। আনসারী এবং আজমল খাঁনের হস্তক্ষেপে দিল্লীর খিলাফত সংগঠনের কাজ আরও তরান্বিত হয়েছিল। তাঁরা অসহযোগকে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির উপর সম্পৃক্ত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে এটাকে চালু রাখেন।[১৬৯] ইহা আশ্চর্যজনক ছিলনা যে, উলামারা খিলাফত সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রবেশ করেছিলেন। ইউ পি প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির উপর তাঁরা প্রাধান্য বিস্তার করেন। আজাদ সোবহানী ছিলেন এর সভাপতি এবং আব্দুল মজিদ ও নজির আহাম্মেদ এর প্রচার কার্য পরিচালনা করতেন। তাঁরা বিভিন্ন জেলা, প্রদেশ এবং সর্বভারতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতেন ও তাঁদের অনুসারীরা ছিলেন এসব সম্মেলনের শ্রোতাদের বড় অংশ। অন্যান্য প্রদেশেও তাঁদের প্রাধান্য কম ছিলনা। মৌলভী আকরাম খাঁন, গিয়াস উদ্দিন বাংলার খিলাফত কমিটির চালিকা শক্তি ছিলেন। মাহমুদ সাজ্জাদ ছিলেন বিহারের নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং আব্দুল মজিদ সারার ছিলেন মাদ্রাজের সংগঠক। এসব উলামারা প্রাথমিক পর্যায়ে ইউ পি এবং সমস্ত ভারতের খিলাফত আন্দোলনকে পরিচালিত করতেন। তাঁরা ছিলেন আব্দুল বারীর অনুসারী। আব্দুল বারীকে তাঁরা স্কুল শিক্ষক হিসেবেই শুধু সম্মান করতেন না, অধিকাংশ খিলাফত নেতা তাঁকে পীর হিসেবে সম্মান করতেন। তিনিই প্রথম খিলাফত আন্দোলনের পক্ষে ফতোয়া দেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা আন্দোলনকে পুনরায় অগ্রগতির দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদেরকেও তিনি ফতোয়া দেন। তাঁর ফতোয়া সমগ্র

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের মুসলমানদেরকে আলোড়িত করে। ১৯১৯ সালের নভেম্বরে দিল্লীতে এবং ১৯২০ সালে এলাহাবাদের সভায় যে সকল উলামারা উপস্থিত ছিলেন আব্দুল বারী তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১৭০]

উলামারা গান্ধীজি এবং ইয়ংপার্টির সাহায্যে খিলাফত আন্দোলনকে এক ব্যাপক আন্দোলনে রূপান্তর করতে পেরেছিলেন। খিলাফত কমিটি এবং 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' যখন ইসলামীক রাজনীতিকে জাগ্রত করে তখন মুসলিম রাজনীতির মুখপাত্র মুসলিম লীগ সরে আসে।[১৭১]

১৯১৯ সালের মন্টেগো-চেমসফোর্ড কর্তৃক শাসন সংস্কার বিধি অনুসারে ১৯২০ সালের ডিসেম্বরের গোড়ারদিকে বঙ্গের প্রথম ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন খিলাফত ও কংগ্রেস ঠেকাতে না পারলেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। খিলাফতীরা এবং কংগ্রেসীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় তাদের বিরোধিরা আনায়াসে নির্বাচনে জয়ী হন। সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন সংখ্যক ভোট নির্দিষ্ট না থাকায় কোন কোন প্রার্থী অল্প সংখ্যক ভোট পেয়েও নির্বাচিত হন এবং নির্বাচনে অশ্রদ্ধা জানানোর জন্য অযোগ্য প্রার্থী দাঁড় করিয়ে সরকার ভক্ত অপেক্ষাকৃত যোগ্য প্রার্থীকে পরাজিত করে। নোয়াখালী জেলায় একটি নজীর স্থাপন হয় যে, এ জেলার ভোটাররা মোকররম আলী নামক গরুর গাড়ীর জনৈক গাড়োয়ান এবং রসিকলাল চর্মকার নামক অতিসাধারণ এক মুচিকে ভোট দিয়ে আইন সভার সদস্য নির্বাচন করে যা ইতিহাসে অম্লান হয়ে রয়েছে।[১৭২]

১৯২০ সালের ২৬ ডিসেম্বর নাগপুরে রঘু আচারিয়ার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গান্ধীজির অসহযোগ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এ সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে যায়। মি. সি. আর. দাস খোলাখুলি অসহযোগের সমর্থন করেন। লালালাজপত রায় প্রথমে কিছুটা বিরোধিতা করলেও পাঞ্জাবী প্রতিনিধিদের সমর্থনের কারণে তিনি তাঁদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে একত্মতা প্রকাশ করেন।[১৭৩] জিন্নাহ সাহেব বিরোধিতাই করলেন।[১৭৪]

তাই গান্ধীজি এ সময় থেকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কমান্ডার ইন-চিফ-এ পরিণত হন। তাঁর সাথে ছিল পুরো ভারত, সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান – কংগ্রেস, মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

লীগ, খিলাফত কমিটি ও জমিয়ত-এ-উলামা-এ হিন্দ। ভারতে এক বাক্যে হিন্দুদের জন্য স্বরাজ এবং মুসলমানদের জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চরমরূপ লাভ করে।

গান্ধীজি, মওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী পুরো ভারত সফর করেন। তাঁরা সব জায়গায় অভিনন্দিত হলেন। গান্ধীজি বেশী সময় বক্তৃতা করতে পারতেন না। কিন্তু মুহাম্মদ আলী দুই-আড়াই ঘন্টায়ও বক্তৃতা শেষ করতে পারতেন না। তিনি নিজেও কাঁদতেন এবং অপরকেও কাঁদাতেন।

মুহাম্মদ আলী ১৯২১ সালে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার হবার পূর্ব পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনকে জোড়দার করার উদ্দেশ্যে নাগপুর, কলকাতা, বোম্বে, আলীগড়, আজমীর, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিয়ে ঘুরে বেড়ান এবং বড় বড় জনসভায় বক্তৃতা করেন। খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে সহযোগিতা করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন কংগ্রেস, খিলাফত, স্বরাজ আর গান্ধীজি, মুহাম্মদ আলী, শওকত আলী-এ শব্দগুলো ছিল সমার্থক। জনগণ মনে করতো এঁদের হাতেই বোধ হয় ভারতের ক্ষমতা। এ সময় মুহাম্মদ আলীর খ্যাতি চরমে উঠে যা জিন্নাহ-এর খ্যাতিও অনেকটা ম্লান হয়ে যায়। গান্ধীজির পরে তিনি ছিলেন ভারতের সবচাইতে বড় জনপ্রিয় নেতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম জননেতা। খিলাফত আন্দোলন ছিল সারা ভারতে প্রথম গণ আন্দোলন এবং এর জন্য মুহাম্মদ আলীর দানই ছিল সবচাইতে বেশী। মুসলমানরা মনে করতেন, খিলাফত না টিকলে বোধ হয় ইসলামই টিকবেনা।[১৭৫] তাই তারা ভাবতেন খিলাফতের জন্য জান না দিলে ইসলামের জন্য কিছুই করা হলোনা।[১৭৬] এ প্রেরণা নিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী বিশেষকরে মুসলমানরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেকেই চাকুরী ছেড়ে দেন। শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দেন। কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে আন্দোলনে ইন্দন যোগান। মওলানা জাফর আলী খাঁন, মওলানা হসরত মোহানী, কবি নজরুল ইসলাম প্রমূখ তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা খিলাফত আন্দোলনকে শানিত করে তোলেন। গ্রেফতার চলতে থাকে, কারাগার ভরে উঠে।

সারা ভারতে খিলাফতের একটি গান প্রচলিত হয়, তার একটি শ্লোক হলো:-

বোলি আম্মা মুহাম্মদ আলী কি

Dhaka University Institutional Repository

জান বেটা খিলাফত পে দা দো

বাংলা অনুবাদ: মুহাম্মদ আলীর মা বলেছেন;

বৎস, খিলাফতের তরে সঁপে দাও প্রাণ।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর আত্মজীবনীতে অসহযোগের প্রস্তাব পাশের জের বর্ণনা করে বলেন,

> "কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে এবং তা নিখিল ভারত খেলাফত কমিটি কর্তৃক সমর্থিত হওয়ায় ভারতীয় ধনী-দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হোল, তেমন ব্রিটিশ বিরোধী ব্যাপক আবেগের প্রকাশ ভারতে কখনো দেখা গেছে কিনা, আমার জানা নাই। .... দেশীয় সংবাদপত্র গুলো মহাত্মা গান্ধীর এই আন্দোলনকে সমর্থন করে জ্বালাময়ী ভাষায় সম্পাদকীয় লিখছিল, হিন্দু-মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই সমর্থনে নগরে-শহরে এমনকি সুদূর পল্লীর হাটে-ঘাটে-মাঠে ব্রিটিশ বিরোধী বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের উপাধিধারী অনুগ্রহভাজনরা অবলীলাক্রমে উপাধি বর্জন করে ব্রিটিশ সরকারের সাথে অসহযোগ ঘোষণা করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের, কলেজের এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্র বর্জন করে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ভারতে বিভিন্ন শহরের বেশ কিছুসংখ্যক উকিল-মোক্তার কোর্ট পর্যন্ত বর্জন করে এই আন্দোলনের সাথে তাঁদের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেছিলেন। ... চোখের সামনে দেখতে লাগলাম, বিলাতী দ্রব্য বর্জনে ইতর-ভদ্র জনসাধারণের বিপুল আগ্রহের প্রকাশ, দল বেঁধে স্কুল-কলেজের ছেলেদের পিকেটিং করায় প্রদর্শনী এবং পুলিশ কর্তৃক তাদের গ্রেফতারের হিড়িক।"[১৭৭]

১৯২১ সালে অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় উলামারা কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটিতে গৃহীত অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি নজর দেন।[১৭৮] মওলানা মুহাম্মদ আলী ৫০০ উলামার স্বাক্ষর করিয়ে এমর্মে ইশতেহার প্রচার করেছিলেন যে, স্কুল, কলেজ, অফিস এবং সমস্ত ব্যাপারে ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে হবে।[১৭৯] ৫০০ উলামার স্বাক্ষরিত উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইশতেহারকে "মুতাফিকা ফতোয়া" বলা হয়েছিল।[১৮০] দেওবন্দবাসীরা মুতাফিকা ফতোয়ায় স্বাক্ষর করেন।[১৮১]

জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে সি. আর. দাসের নেতৃত্বে খিলাফত অসহযোগ ইস্যুতে ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়, যা সারা ভারতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ছাত্রদের ধর্মঘট ও বিদ্রোহের ফলে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একেবারে অচল হয়ে পড়ে। এর বিকল্প স্বরূপ বহু জাতীয় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৮২]

১৯২১ সালের প্রথমদিকে আলী ভ্রাতৃদ্বয় মওলানা মুহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাতে মুসলমানদের মাঝে নতুন চৈতন্যবোধ সৃষ্টি হয়। কিন্তু মোটের উপর তাঁরা গান্ধীর প্রবল ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁদেরকে গান্ধীজির অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হতো। সারা দেশে গান্ধীজি তাদেরকে নিয়ে গর্জন করেছিলেন এবং সেদিনকার শ্লোগানের কথা স্মরণীয় যে, "গান্ধীজি কি জয়" এবং "আলী ভাইয়ো কি-জয়।"[১৮৩]

১ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদে আজমল খাঁর সভাপতিত্বে কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজি ঘোষণা করলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে সকল রাজবন্দিদের মুক্তি না দিলে তিনি আইন অমান্যকারী আন্দোলন শুরু করবেন।[১৮৪]

মালাবরের কৃষক আন্দোলনকে দমন করার জন্য মালাবরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৯২১ সনের ৫ ফেব্রুয়ারি সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারী করেন। নেতৃবর্গ ইহা প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কৃষক আন্দোলনে বিভিন্ন দমনমূলক ঘটনার পর মালাবারের খিলাফত কমিটির সচিব Khanikhadar কে আইনের আওতায় আনা হয়। তিনি বীরের মত ফাঁসির দড়ি চুম্বন করেন। উক্ত ঘটনাটি ছিল ব্যাপক জনপ্রিয় আন্দোলনের সংকেত স্বরূপ যা পরবর্তীতে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে পরিণত হয়। যেখানে সরকারী উদ্ধৃতি মোতাবেক রেল স্টেশন, টেলিগ্রাফ, ব্রিজ, পোস্ট অফিস, রেজিস্টেশন অফিস ইত্যাদি ভাংচুর, পুড়ানো এবং লুটপাট করা হয়।[১৮৫] কৃষক আন্দোলনের নেতা আব্দুল গাফফার খানের সাথে খিলাফত আন্দোলনের অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।[১৮৬] কৃষক আন্দোলন ব্যর্থ হবার পরেও খিলাফত আন্দোলন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পুরোপুরিভাবে চলতেছিল।[১৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

শিয়ারাও উলামাদের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২১ সনের মার্চে লক্ষ্ণৌর নেতৃস্থানীয় মুস্তাহিদ সৈয়দ ইউসুফ হোসেন অসহযোগের পক্ষে ফতোয়া জারীর জন্য কৌশলগতভাবে গুজব ছড়ান যে, ব্রিটিশরা নাজাফের পবিত্র ভূমিতে বোমাবর্ষণ করেছে। তাই কিছু সংখ্যক শিয়া সুন্নীদের সাথে আন্দোলনে যোগদান করেন যা মুসলমানদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়ের সংযোগ একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।[১৮৮]

১৯২১ সালের মাঝামাঝিতে উলামা তথা মুসলিম নেতৃবৃন্দের আন্দোলন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। সরকার তাঁদের প্রতি ধরপাকড় অভিযান চালায়।[১৮৯] ১৯২১ সালের ৮ জুলাই তারিখে করাচীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় খিলাফত অধিবেশনে জোড়ালো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মুসলমানরা সেনাবাহিনীর চাকুরীতে যোগদান করবেনা।[১৯০] ফিরিঙ্গীমহল (লক্ষ্ণৌ), দেওবন্দ ও অন্যান্য স্থানে ৫০০ আলিমদের স্বাক্ষরসহ মুতাফিকা ফতোয়াটি প্রচারিত হয় যে, ব্রিটিশদের সহযোগিতা করা হারাম। স্কুল-কলেজ বর্জন করা ফরজ, কোর্টে চাকুরী ও ওকালতি করা অবৈধ, পুলিশ ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীভুক্ত থাকা ইসলাম বিরোধী; ব্রিটিশ প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করা কাফিরের কাজ; যারা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবেনা, তারা যেন জিহাদের ময়দান থেকে পলায়িত, এ আন্দোলনে জানমাল বিসর্জন করা ইসলামেরই পরিচায়ক। এ ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা মনে করলেন যে, অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য। ফলে অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়।[১৯১]

মুহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে করাচীর ঐ খিলাফত অধিবেশনে সারা ভারত হতে অনেক গণ্যমান্য মুসলমান এবং বিপুলসংখ্যক হিন্দু-মুসলমান যোগদান করেন। এ সম্মেলনের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য আলী ভ্রাতৃদ্বয় সহ আরো ৫জন নেতা কারাবরণ করেন। তাঁরা হলেন, ডঃ সায়ফুদ্দিন কিচলু, জগতগুরু শ্রী স্বামী শংকর আচারিয়া, মতিয়ারীর পীর গোলাম মুজাদ্দিদ, দেওবন্দের মওলানা হুসাইন আহাম্মদ মাদানী, কানপুরের মওলানা নিসার আহাম্মেদ। ৫০০ উলামার ফতোয়ার সমর্থনে মুহাম্মদ আলী সভাপতির ভাষণে বলে ছিলেন,

> "ইসলামের ডাকে মুসলিম সৈনিকদের সাড়া দেওয়া উচিৎ, গভর্নমেন্টের চাকুরীর মাথায় লাথি মারা উচিৎ। কারণ সেনাবাহিনীতে চাকুরী করলে বাধ্য হয়ে নিজ মুসলিম ভাইদের উপর গুলি চালাতে হয়। যে সব পবিত্র স্থানের রক্ষণাবেক্ষণে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া দরকার, সেখানে তাঁরা বাধ্য হয়ে গুলি চালায়, তোপ চালায়। সামান্য অর্থের জন্য তাঁদেরকে এসব পবিত্রস্থান ধ্বংস করে নিজেদের পরকালীন জীবন নষ্ট করতে হয়। কুরআনে উল্লেখ আছে, "যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজ মুসলমান ভাইকে হত্যা করে, তার পরিণাম হলো জাহান্নাম।"

তিনি তাঁর ভাষণের পর বিষয়টি অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন। উপস্থিত আলিমগণ সাগ্রহে তা পাশ করেন। সরকার করাচী প্রস্তাবকে ব্রিটিশ বিরোধী প্রস্তাব হিসেবে আখ্যায়িত করে মুহাম্মদ আলী ও তাঁর ৫ জন সহকর্মী নেতাকে অভিযুক্ত করেন। ১৯২১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ আলীকে মাদ্রাজের পথে ওয়ালটেয়ার রেলস্টেশনে গ্রেফতার করে করাচীতে পাঠিয়ে দেয়। মুহাম্মদ আলী তখন মহাত্মাগান্ধী সহ ক্ষুদ্র একদল সহকর্মী এবং ব্যক্তিগত সেক্রেটারিকে নিয়ে মালাবার যাচ্ছিলেন। ২১ জুলাই করাচীর ঈদগাহে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যও তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় এবং দু বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[১৯২]

১৯২১ সালের জুলাই মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় খিলাফত অধিবেশনে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, ব্রিটিশরা যদি তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যায় তাহলে মুসলমানরা কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে সাম্প্রদায়িক পথ পরিহার করে ভারতে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করবেন। তাই সে মুহূর্তে আন্দোলনকারীরা এবং ধর্মীয় নেতারা পরিষ্কার ভাবে ভারতকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করতে ছিলেন। সরকার এর মাঝ পথে বাধা দিতে শক্তি প্রয়োগ করল। এটাকে প্রতিরোধ করা হল, চাপ প্রয়োগ করা হল এবং যাঁরা অধিবেশনের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নের জন্য পৃষ্টপোষকতা করতে ছিলেন তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্যদের কারারুদ্ধ করা হলো। যাঁরা ছিলেন, হুসাইন আহাম্মেদ মাদানী, দেওবন্দির নতুন নেতা আব্দুল বারীর সিন্ধুর অনুসারী পীর গোলাম মোজাদ্দীদ এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়। শীঘ্রই পরবর্তীতে "মুতাফিকা ফতোয়াকে" বে-আইনী হিসেবে নিষিদ্ধ করা হল।[১৯৩]

দিল্লীতে ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত খিলাফত সভায় সরকার কর্তৃক কোরআনের আয়াত নিষিদ্ধ করা এবং সম্মানিত নেতাদের কোরআনের বাণী প্রচারের জন্য গ্রেফতার করায় তাঁরা ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌছে। আইন অমান্যকারী আন্দোলন ছাড়া আর কোন উপায় নেই– এরূপভাবে প্ররোচিত করা হল। সে সময় উলামারা ছিল খুবই আন্দোলন মুখর।[১৯৪] কারণ

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আলী গ্রেফতার হবার পর আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। বেগম মুহাম্মদ আলী ও মুহাম্মদ আলীর মা প্রচার কার্য চালিয়ে যান এবং খিলাফত কর্ম কাণ্ডের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে থাকেন। খিলাফত প্রচারকার্যে কংগ্রেস নেতাদের খরচ ও অন্যান্য ব্যয় খিলাফত তহবিল থেকেই দেওয়া হতো।[১৯৫]

উলামাদের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা এবং চরম মনোভাবের জন্য গান্ধীজি পরিষ্কারভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন এবং তিনি পূর্বেই এটাকে থামানোর জন্য তাঁর কৌশলটাকে পরিবর্তন করেছিলেন।[১৯৬] কারণ খিলাফত কমিটির সাথে কংগ্রেসের বিরাট পার্থক্য ছিল যে, খিলাফতীরা চেয়েছিলেন পূর্ণস্বাধীনতা এবং কংগ্রেস চেয়েছিল ডোমিনিয়ন স্টেটাস বা স্বায়ত্তশাসন। ১৯২১ সনের আহমেদাবাদের কংগ্রেস অধিবেশনে মওলানা হযরত আলী সৎসাহস কিংবা দুঃসাহস নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর কথা উত্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলে ফেললেন, "The demand has grieved me because it shows lack of responsibility." এভাবে মুসলমানরা বার বার পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলে অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছেন।[১৯৭]

১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে মহাত্মা গান্ধী ও মওলানা আজাদসহ ৩০/৩৫ জন হিন্দু-মুসলিম নেতা করাচী-প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করেন[১৯৮] এবং অক্টোবরের ৪ তারিখে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের, খিলাফতীদের এবং উলামাদের স্বাক্ষরিত একটি ইশতেহার গান্ধীজি প্রকাশ করেন, যা করাচীর খিলাফত অধিবেশনে অনুমোদন হয়েছিল।[১৯৯] দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা, আরা, নাগপুর, লাহোর ও অন্যান্য স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং করাচী প্রস্তাবের বাস্তব প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। খিলাফত আন্দোলনে সারা ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে।

১৯২১ সালের ৪ নভেম্বর দিল্লীতে লালালাজপত রায়ের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি কিছু সংশোধিত আকারে গৃহীত হয় এবং করাচীর সর্বভারতীয় খিলাফত অধিবেশনের প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৮ নভেম্বর মওলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে লাহোরে জমিয়ত-এ-উলামা-ই-হিন্দ এর তৃতীয় অধিবেশনে নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবলী গৃহীত হয়:-

১. বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা হোক এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা হোক।

২. অমুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তুর্কীদের কর্মকাণ্ডে সাহায্য করা হোক।

৩. সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা উলামা প্রচারিত ফতোয়ার পুনর্মুদ্রণ করা হোক।

১৯ নভেম্বর বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কর্তৃক কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যে পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ ও আসাম প্রদেশের স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলোকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[২০০] নভেম্বর ও ডিসেম্বরে গণহারে কংগ্রেস ও খিলাফত নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। গান্ধীজি এতে অসন্তোষ্ট হলেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমোদনের জন্য আহমেদাবাদে কংগ্রেসকে বললেন।[২০১] তখন নেতা-কর্মীদের শুধু গ্রেফতারই করা হয়নি– জেল, জরিমানা ও নির্যাতন-অভিযানও করা হয়েছিল। খিলাফত ও কংগ্রেস অফিসে তল্লাসী করে আন্দোলন সংক্রান্ত কাগজ পত্রও আটক করা হয়। এতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয় এবং হাজার হাজার লোক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করেন এবং কারাবরণও করেন।

১৯২১ সালের ১৭ নভেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস যখন বোম্বে আসেন তখন হরতাল পালিত হয়। ঐ হরতালে ৫৩ জন মারা যান এবং ৪০০ জন আহত হন। এতে গান্ধীজি দুঃখিত হয়ে তিনি যে আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়েছিলেন তা মূলতবি ঘোষণা করেন। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে দেশে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় সরকার ধরপাকড় শুরু করে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলো বন্ধ করে দেয়। জনগণ ধর্মীয় প্রেরণায় স্বেচ্ছায় গ্রেফতার ও কারাবরণ করেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে খিলাফত ও কংগ্রেসের বড় বড় নেতা যেমন মওলানা আজাদ, চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু প্রমুখকে অন্তরীণ করা হয় এবং রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা বিশ হাজারে উন্নীত হয়।[২০২]

২৬-২৭ ডিসেম্বর আহমদাবাদে হাকিম আজমল খাঁর সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় খিলাফত অধিবেশনে অহিংস আইন অমান্যের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২০৩] তাঁদের লক্ষ্য ছিল

Dhaka University Institutional Repository

ভারতকে ব্রিটিশ থেকে পৃথক করা। আজাদ সোবহানী এবং হসরত মোহানী ছিলেন ঐ অধিবেশনের বক্তা।[২০৪] অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে আজাদ সোবহানী হসরত মোহানীর সমর্থনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করার এবং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের একটি প্রস্তাব পেশ করেন। সভাপতি আজমল খাঁন প্রস্তাবটির অনুকূলে থেকে ঘোষণা করেন যে,

> "The Subjects Committee of the conference had, on the motion of Mr. Azad Sobhani, Supported by Mr. Hasrat Mohani, by a majority resolved to ask all Mohammedans and other communities to endeavour to destroy British Imperialism and secure independence."[২০৫]

মৌলভী আব্দুল বোদাউনী এবং দাউদ গজনবী কর্তৃক সমর্থিত হয়ে আজাদ সোবহানী Subjects Committee তে তাঁর প্রস্তাব সমর্থনের জন্য অগ্রসর হলেন যা ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করা কিন্তু তিনি কঠোরভাবে রাজনীতিকদের সম্মুখীন হলেন। আনসারী, রেজা আলী, হাকিম আজমল খাঁন এবং সৈয়দ জহুর আহম্মেদ তাঁকে ৩৬/২৩ ভোটে পরাজিত করেন।[২০৬]

২৭ ডিসেম্বর আহমদাবাদে হাকিম আজমল খাঁর সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে যথাশীঘ্র আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে বলে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজও গৃহীত হয়। তাঁর প্রস্তাব ছিল, "অহিংস নীতির মধ্য দিয়ে ভারতের স্বরাজ (পূর্ণ স্বাধীনতা নয়) অর্জন করতে হবে।" হসরত মোহানী ঐ প্রস্তাবে একটি সংশোধনী পেশ করেন, "যে কোন উপায়ে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।" সংশোধনীটি উত্থাপন করতে গিয়ে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জোড়ালো বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা শেষে গান্ধীজি তাঁর ভাষণে বলেন,

> "মওলানা হসরত মোহানী যদি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে যান, তবে আমি পিছিয়ে থাকবো না। কিন্তু, কথা হলো– এর জন্য শক্তি অর্জনের প্রয়োজন। আমি তো আগ্রার কেল্লার উপর কংগ্রেসের ঝাণ্ডা উড্ডয়ন করতে পারি, যদিও সেখানে হিটলারের মত ক্ষেপা গভর্নর রয়েছেন। কিন্তু এটা করতে হলে ক্ষমতার প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

আমি এমন কথা বলবো না, যা আমি করতে পারবোনা বা যা করার ক্ষমতা আমার নেই।"

শেষ পর্যন্ত মোহানীর সংশোধনীটি নাকচ হয়ে যায় এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।[২০৭]

৩০ ডিসেম্বর আহমদাবাদে হসরত মোহানীর সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে তুরস্ক খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও আংকারার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২০৮] মওলানা মোহানী সভাপতির ভাষণে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, "কংগ্রেসের লক্ষ্য হলো বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ অর্জন করা অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্তশাসন লাভ করা। এ লক্ষ্য যথেষ্ট নয়। লক্ষ্য হওয়া উচিৎ যথাসম্ভব ও যথোপযুক্ত উপায়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে ভারতে একটি রিপাবলিক স্টেট প্রতিষ্ঠা করা।"

ঐ মর্মে মওলানা আজাদ সোবহানীও যথারীতি একটি প্রস্তাব পেশ করেন। যা Subjects Committee তে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তবুও সভাপতি হসরত মোহানী এ শর্তে প্রস্তাবটি অধিবেশনে পেশ করার অনুমতি দেন যে, বিষয়টির উপর আলোচনা করা যাবে, কিন্তু ভোটাভোটি হবেনা। প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে গেছে বলেই ধরে নিতে হবে। বস্তুত তাই করা হলো।[২০৯]

১৯২২ সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে আন্দোলন এমন পর্যায়ে যায় যে, যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এর প্রথম কারণ হলো – অসহযোগের অনেক নেতাকে জেলে আটক করা, দ্বিতীয় কারণ হলো আন্দোলনের ব্যাপকতায় জনগণের মাঝে উত্তেজনা শুরু হওয়া। সুলতান পুরের আমেথির রাজা শংকিত হয়ে তাঁর পরিবার পরিজন এবং স্বর্ণ সহ জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।[২১০]

বারবানকির একজন মুসলমান জমিদার তাঁর ১২০০ স্বধর্মীকে নিয়ে জেলাশহরের হেডকোয়ার্টার ঘেরাও করলেন। সরকারকে গালি দিলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন।[২১১] এমনকি চির আত্মবিশ্বাসী হারকোর্টবাটলারও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বললেন যে, উগ্র মুসলমানরা নাগালের বাইরে চলে গেছেন।[২১২]

Dhaka University Institutional Repository

মহাত্মা গান্ধী ভাইসরয়ের নিকট ১৯২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আবার তড়িঘরি আইন অমান্য আন্দোলনের নোটিশ দেন।[২১৩] তিনি তাঁর নোটিশে আরও জানান যে, খিলাফতের প্রতি একেবারে অস্বীকার করায় সর্বভারতীয় কংগ্রেসে সরকার বিরোধী আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।[২১৪] এছাড়াও তিনি খিলাফত আন্দোলনকারীদের মাঝে যাঁরা জেলে আছেন অথবা বিচারাধীন আছেন তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্যও নোটিশে উল্লেখ করেন।[২১৫]

আনুষ্ঠানিকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবার কয়েকদিন পূর্বেই ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ তারিখে ইউ পি এর গোরাকপুর জেলার চৌরীচৌরা পুলিশ ক্যাম্পে উগ্র জনতা আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে ২১ জন পুলিশ পুড়ে প্রাণ হারায়। এতে মহাত্মা গান্ধী বিচলিত হন।[২১৬] পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রথম থেকেই অসহযোগের বিরোধিতা করেছিলেন এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রবল প্রভাবও তিনি সহ্য করতে পারেননি। তিনি ভাবতেন, আলী ভ্রাতৃদ্বয় ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান। তিনি অযথা রটিয়েছিলেন যে, মুসলমানরা আফগানিস্তানের সাহায্যে ভারত আক্রমণ করবেন। চৌরীচৌরার ঘটনার সুযোগ নিয়ে তিনি গান্ধীজিকে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার পরামর্শ দেন। গান্ধীজি সন্ত্রাস এড়ানোর জন্য বারদৌলি গিয়ে ১৯২২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তুঙ্গে উঠা অসহযোগ আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেন। তিনি বললেন,

> "The tragedy of chaurichaura is really the index finger; it shows the way India may so easily go, if drastic precautions be not taken. Our non-violence is skin-deep. We are burning with indignation. ...This non-violence, therefore, seems to be due merely to our helplessness."[২১৭]

গান্ধীজি বুঝতে পারলেন যে, অসহযোগ আন্দোলনের উপর তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। তাই তিনি আন্দোলনের স্থগিত ঘোষণা করেন।[২১৮]

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ অনেকের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি গান্ধীজির সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে। এতে মুসলমানরা নিরাশ হন। গান্ধীজির অনেক ভক্তও বিগড়ে যান। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরোধীতা করে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"Were a remote village and mob of excited peasants in an out of way place going to put an end, for sometime at last, to our national struggle for freedom? If this was the inevitable consequence of a sporadic act of violence, then surely there was something lacking in the philosophy and technique of a non-violent struggle for freedom."[২১৯]

সরকার আন্দোলনের প্রতি গান্ধীজির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আন্দোলন দমনে সুযোগ লাভ করে।[২২০]

যা হোক, গান্ধীজির সিদ্ধান্তের কারণে খিলাফত আন্দোলনের ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের যে মিলন, যা ক্রমশ দানা বেঁধে উঠেছিল তা ভেঙ্গে গেল।[২২১]

খিলাফত প্রশ্নটি রয়েই গেল। তখন তুরস্কের জাতীয়তাবাদীরা গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ছিলেন। লেজান চুক্তি অনুসারে উলামারা খিলাফত রক্ষা এবং অনুরূপভাবে ভারতে মুসলমান সমাজে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ক্রমাগতভাবে আন্দোলন করতে ছিলেন। ইয়ং পার্টির রাজনীতিকরা গান্ধীজির সিদ্ধান্তে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। একদিকে তাঁরা ধর্মীয় ইস্যুতে রাজনৈতিক শক্তির প্রতি ক্রমাগত সুযোগ নিতে বিমূখ ছিলেন না। আনসারী এবং আজমল খান তুর্কী প্রশ্নের পূর্ন সমাধানে ইচ্ছা পোষণ করেন নাই।[২২২] অন্যদিকে এ সমস্ত রাজনীতিকরা জানতেন, শেষ উপায় হিসেবে তাদের ভবিষ্যৎ হল – কংগ্রেসকে ঐ সব উপদলগুলোর সাথে জড়িত করে একটা রাজনৈতিক সমাধান করা এবং সবশেষে কাউন্সিলে প্রবেশ করা। যখন কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় তখন ইয়ং পার্টির মুসলমানরা এবং খিলাফত কমিটি তাঁদের কৌশল পরিবর্তন করেন।

কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে গেলেও উলামাদের তখন পর্যন্তও নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাঁরা বারদৌলির রেজুলেশনের প্রতি ক্ষিপ্ত হলো এবং গান্ধীজির গ্রেফতারের কিছুদিন আগে আজমীরে জমিয়ত-এ-উলামা-ই-হিন্দ সম্মেলনে তাঁদের ক্ষিপ্ত হবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। তাঁরা উগ্রতা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ইয়ং পার্টির নেতা আনসারী, শেখ জহুর আহাম্মেদ এবং বিহারের সৈয়দ মাহমুদ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেন। আব্দুল বারী তাঁর সভাপতির সমাপনী বক্তৃতায় বারদৌলির রেজুলেশন এবং

Dhaka University Institutional Repository

অহিংস্রতাকে আক্রমণ করে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন যে, মহাত্মা গান্ধীর সকল কর্মসূচি শেষ হয়ে গেছে তাই গান্ধীজির পক্ষে এখন আর কিছুই করার নেই। তাই মুসলমানদের এখন উচিৎ নীরব থাকা এবং তাঁদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছু সম্মুখ কর্মসূচির প্রয়োজন। আনসারী ছিলেন ক্রোধোন্মত্ত এবং আব্দুল বারীকে গর্দভ, কপট এবং কুখ্যাত শিকারী বলে অভিহিত করলেন। তখন আতংক বিরাজ করতেছিল এবং মনে হলো, ধর্মগুরু এবং রাজনীতিকরা আলাদা হয়ে গেল। গান্ধীজিকে ডেকে পাঠানো হল এবং তিনি আজমীরে দ্রুত এলেন এবং উত্তেজিত আলিমদের কাছ থেকে আন্দোলনকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করার মনোভাব আদায় করলেন।[২২৩] আজমীরের ভাষণ শেষে গান্ধীজিকে ১৯২২ সালের ১০ মার্চ গ্রেফতার করা হয় এবং বিচরে তিনি ছয় বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন।[২২৪]

কিন্তু উলামারা দীর্ঘ সময়ের জন্য নীরব থাকতে পারলেন না। জুন, ১৯২২ লক্ষ্ণৌতে জমিয়ত-উলামা-ই-হিন্দ, কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এক যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। জমিয়ত-এ-উলামা-ই-হিন্দ এর নির্বাহী কমিটি প্রচণ্ড উগ্রাবস্থায় ছিল।[২২৫] তাঁরা পূর্ন স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেন এবং প্রস্তাব করা হয় যে, "ভারত বর্ষ এবং মুসলমানদের স্বার্থের খাতিরে এখন হতে কংগ্রেসের মূলমন্ত্র স্বরাজের পরিবর্তে পূর্ন স্বাধীনতা হওয়া উচিৎ।" এবারও কংগ্রেস বিরোধিতা করে বলল, "এতদ্বারা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন হবে।"[২২৬]

ঐ অধিবেশনে উলামারা অভিযোগ করলেন যে, কোরআনকে প্রত্যহ অবমাননা করা হচ্ছে, খিলাফত প্রশ্ন এখন পর্যন্তও অমীমাংসিত অবস্থায় আছে। যদি তারা ইসলামকে রক্ষা করতে চায় তাহলে বারদৌলির কর্মসূচিকে নির্ভর করা উচিৎ হবেনা।[২২৭]

গোরকাপুর, বাস্তি এবং আজম গড়ের লোকেরা আজাদ সোবহানীকে নেতৃত্বদানের কথা বললেন। আব্দুল মজিদ ইউ পি এর ১২টি এবং মাদ্রাজের ৮টি জেলাকে যে কোন ধরনের কাজের জন্য একত্রিত করলেন। জমিয়ত-এ-উলামা-ই-হিন্দ কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির রেজুলেশনের দাবীর পূর্বেই খিলাফত কার্যকরী কমিটিকে তাদের সাথে যোগদানের জন্য বুঝালেন। কংগ্রেসের রেজুলেশন ছিল: ১। ব্যক্তি স্বাধীনতা অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, ২। বয়কট নীতির বিস্তার ও ৩। স্বরাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আখ্যায়িত করণ। যখন তিনটি

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি মিলিত হল তখন প্রথম দুটি আরও বিবেচনার জন্য আলাদা করা হয়েছিল এবং তৃতীয়টাকে সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় রাখা হলো। কিছুসংখ্যক উলামাকে সর্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং সেখানে তাঁরা তর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কংগ্রেস নেতাদের আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য কঠোরভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। উলামারা বললেন যে, তাঁরা সরাসরি জনগণের আইন অমান্য আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে চান এবং এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে এটা কখন শুরু করা যাবে তার জন্য তাঁরা সময় চেয়েছিলেন। কংগ্রেস কমিটি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কিন্তু বাস্তবায়িত করলেন না। দুদিন পর উলামারা খিলাফত কমিটির কাছ থেকে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য কমিটিকে রাজী করাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হাকিম আজমল খাঁন এ বিষয়টাকে বিরত রাখতে উপদেশ দিলেন যে, মুসলমানরা এরূপ অভিযানে জয়লাভ করতে পারবেনা। তাঁদের উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ধৈর্যসহকারে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যক লোকের সাথে সংযুক্ত হলেন যারা জোড়ালোভাবে হাকিম আজমল খাঁন ও আনসারীকে দীর্ঘসময়ের জন্য আন্দোলনে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী সপ্তাহে হাকিম আজমল খাঁন এবং আনসারী উভয়ে এক সাথে রাজনীতি পরিহার করতে স্বাক্ষর করলেন কিন্তু রাজনীতি পরিহার করতে স্বাক্ষর করলেও তাঁরা রাজনীতিতে থেকেই গেলেন। ১৯২২ সালের জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন আংশিকভাবে ঝিমিয়ে পড়ল।[২২৮] কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি তদন্ত করে দেখলো যে, ভারতের কোন অংশই এ আন্দোলনের জন্য তৈরি নয়।

অন্যদিকে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা কামাল আতাতুর্ক এবং তাঁর সমর্থক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণে সংগ্রামরত ছিলেন।[২২৯] তাঁরা ১৯২২ সালের নভেম্বরে তাঁদের জাতীয় পরিষদে সুলতান-খলিফা ৬ষ্ঠ মুহাম্মদকে পদচ্যুত করেন এবং তদস্থলে আব্দুল মজিদকে সুলতান না করে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করে তাঁকে পার্থিব ও প্রশাসনিক ক্ষমতাবিহীন খলিফা বলে ঘোষণা করেন।[২৩০] তাই ১৯২২ সালের নভেম্বরে তাদের মূল ইস্যু দীর্ঘায়িত হলোনা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৩ সালের কাউন্সিল নির্বাচনের অংশগ্রহণের প্রশ্নে খিলাফতের তদন্ত কমিটি বিরোধিতা করল। শুধুমাত্র শেখ জহুর আহাম্মেদ অংশগ্রহণের পক্ষে মতামত দেন। কংগ্রেস ও তদন্ত কমিটি কাউন্সিল নির্বাচন প্রশ্নে সমভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ল। হাকিম আজমল খাঁন, মতিলাল নেহেরু, ভি. এফ. পাটেল, কাউন্সিলের পক্ষে ছিলেন এবং আনসারী, কাসতুরী রাঙ্গা আইয়েনগার এবং রাজা গোপাল আচরিয়ার এর বিরোধিতা করেন।

গয়াতে উলামাদের প্রভাব যা ১৯২২ সালের মধ্যভাগে হারিয়ে ফেলেছিলেন তা পুনরুজ্জীবিত হলো। লোজানের শান্তিচুক্তি এবং টার্কদের দ্বারা নভেম্বরে খিলাফতের সাময়িক ক্ষমতার বিলুপ্তি উভয়ই ছিল ধর্মীয় ব্যাপার। মুসলমানরা উলামাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য তাঁদের প্রতি তাকিয়ে রইলেন। এছাড়াও তাঁদের হাতকে শক্তিশালী করতে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যের প্রয়োজন। তাই তাঁরা কংগ্রেসকে ঐক্যের জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁদের ঐক্য যা মোফলার দাঙ্গার জন্য বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। তা উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য আরও হুমকীর সম্মুখীন হলো। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক শান্তি রক্ষার্থে ছাড় দিতে তৈরি ছিল।[২৩১]

দাস কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ঘোষণা দিলেন যে, কংগ্রেসকে দ্বিধাহীন ভাবে উলামাদের অনুরোধ রক্ষা করা উচিৎ কারণ হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য ছাড়া স্বরাজের পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব নয়।[২৩২] উর্দূ পত্রিকাগুলো ব্রিটিশদের উগ্রতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। উলামারা মুসলমানদের আন্দোলনকে শীর্ষে রাখতে সমর্থ হলেন। *Leader* পত্রিকা ১৯২৩ এর এপ্রিলে মন্তব্য দিল যে, Every political line of action is now put the test of religion and the fatwas of the Ulema are supreme.[২৩৩]

জুলাই ১৯২৩ লোজান চুক্তি স্বাক্ষরিত হল এবং খিলাফত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ খলিফা পদ্ধতি বাতিল করে একটি স্বাধীন তুরস্কের উদয় হল।[২৩৪] আংকারার জাতীয় পরিষদ তুরস্ককে যখন প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল তখন ভারতের জমিয়ত-এ-উলামা-ই-হিন্দ ও খিলাফত কমিটি ১৯২২-এর ডিসেম্বরে আংকারার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল এবং তুরস্ক পরিষদকে শরিয়ত মোতাবেক খলিফার মর্যাদা ও শাসন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু কামাল পন্থী জাতীয়তাবাদীরা যুদ্ধের ময়দানে বিজয় অর্জন ও লোজান চুক্তির স্বীকৃতি লাভ করায় ভারতের খিলাফত পন্থী মুসলমানদের পরামর্শ গ্রহণ করেনি।[২৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

কিছু সংখ্যক উলামা বিশেষ করে আব্দুল বারী জাজিরাতুল আরবের কিছু অংশ বিদেশীদের দখলে থাকায় আন্দোলন চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কিছুটা সফল হলেও তাঁদের ধর্মীয় মনোবল হারিয়ে ফেললেন। উলামাদের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার অন্য কারণ হলো সাম্প্রদায়িক বিরোধ বেড়ে যাওয়া। ১৯২৩ সালের জানুয়ারিতে *Leader* পত্রিকা ঘোষণা দিল যে, At present the fear is only too real in mind of many a Hindu that the leanings of the average Indian Musalman are not national but extraterritorial, and that fair is obviously a bar to true national solidarity.[২৩৬]

কিছু কালের মধ্যেই খলিফা আব্দুল মজিদ তুরস্কের ঘরোয়া ও বৈদেশিক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে তুরস্কের ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পাঁয়তারা করেন। তাঁর এ বিষয় আংকারার কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলেন। তাই কামাল পন্থী সরকার ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ আইন করে খিলাফত বাতিল করেন এবং খলিফা আব্দুল মজিদকে স্বপরিবারে কারারুদ্ধ করেন। এতে ভারতের খিলাফতীরা হতভম্ব হলেন। অথচ কামাল পাশার বিজয় অভিযানের সময় ভারতের মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁর বিজয়ের গানও গেয়েছিলেন। তাঁরা একসময় সেভরে চুক্তি বাতিল ও স্মার্না এবং থ্রেস তুরস্ককে ফেরৎ দেবার জন্য ভারত সরকার অর্থাৎ ব্রিটিশদের উপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন।[২৩৭]

আরবরা তাঁদের স্বতন্ত্র শাসনাধিকার কামনা করতেন এবং সে প্রেক্ষিতে তুরস্কের জাতীয়তাবাদীরাও আরবকে তাঁদের কুক্ষিগত করে রাখতে পক্ষপাতী ছিলেন না। মুহাম্মদ আলী অবশ্য আরবদের স্বাধীনতা স্বীকার করতেন। কিন্তু তিনি পবিত্র স্থানগুলো তুরস্কের খলিফার অধীনে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।[২৩৮] আংকারা কর্তৃপক্ষ তুরস্কের খিলাফত রহিত করায় মুহম্মদ আলী তারযোগে আংকারার কর্তৃপক্ষের নিকট এর প্রতিবাদ করেন। তাঁর উত্তরে আংকারা থেকে বলা হয় যে, "আমরা এতদিন ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বোঝা টেনেছি, এখন সেই দায়িত্ব অন্য কোন দেশের পালন করা উচিৎ। তুরস্ক অন্যান্য দেশের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক রাখতে চায়না।" ১৯২৪ সালের ১১ মার্চ জমিয়ত-এ-উলামা-ই-হিন্দ তারযোগে কামালপাশার নিকট খিলাফত সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের আবেগের কথা

Dhaka University Institutional Repository

জানায় এবং তাঁকে প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে। এছাড়াও তুরস্কের জাতীয় পরিষদের নিকট ভারতীয় মুসলমানদের এক প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্যও আবেদন জানায়। আগাখান এবং আমীর আলীও তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর নিকট খিলাফত রক্ষার আবেদন করেন। কিন্তু তুরস্কের কর্তৃপক্ষ এসমস্ত অনুরোধ রক্ষা করতে অস্বীকার করেন। [২৩৯]

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ এবং মিত্রশক্তি কর্তৃক তুরস্কের মুসলিম খিলাফতের যে বিপর্যয় ঘটে – পৃথিবীর আর কোন মুসলিম দেশ এ বিপর্যয়ের হাত থেকে খিলাফতকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেনি অথবা আন্দোলন করেনি। অথচ ভারতীয় মুসলমানরা তাঁদের জানমাল বাজি রেখে তুরস্কের সমর্থন ছাড়াই তুরস্কের মুসলিম খিলাফতকে তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে খিলাফতের এ বিপর্যয় থেকে খিলাফতকে রক্ষা করার জন্য খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেনি। [২৪০]

তথ্যসূত্র

১. শামছুন নাহার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

২. *শওগাত*, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩৫৫

৩. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

৪. সিরাজুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩১-৩২

৫. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

৬. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 292. হাকিম আজমল খান ছিলেন ভারতের ইয়ংপার্টির নেতা এবং দিল্লীর অধিবাসী। সূত্রঃ *Ibid*, p. 376 আনসারী ছিলেন ইয়ং পার্টির নেতা। সূত্রঃ *Ibid*, p. 358

৭. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 293. ফিরিঙ্গী মহল ছিল ইউ পি তে সবচেয়ে পুরাতন নেতৃস্থানীয় মতবাদী উলামা। সূত্রঃ *Ibid*, p. 266. বিশেষ করে মধ্য এবং পূর্ব ইউ পি এবং বিহারের উলেমাদের উপর তাদের ব্যাপক প্রভাব ছিল এবং প্যান-ইসলামী নীতি বাস্তবায়নে তাদের পর্যাপ্ত খ্যাতি ছিল। সূত্রঃ *Ibid*, p. 368

৮. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 271

Dhaka University Institutional Repository

৯. *Ibid*, p. 293. আব্দুল বারী ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় ফিরিঙ্গী মহল মতবাদী উলেমা। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌর অধিবাসী এবং হাদিস বিশারধ শিক্ষক, লেখক এবং পীর। ১৯০৮ সালে তিনি ফিরিঙ্গী মহলে মাদ্রাসা নিজামীয়া স্থাপন করেন। সূত্রঃ *Ibid*, p. 419

১০. *আখোয়াত* (লক্ষ্ণৌ), ১ এপ্রিল, ১৯১৯, *Ibid*, p. 393

১১. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 293

১২. Harcourt Butler to Chelmsford, 20 April, 1919. *Chelmsford paper* (22), IOL. সূত্রঃ *Ibid*, p. 294

১৩. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 292, উলামাপার্টি কোন উত্তরসূরী অথবা ধারক অথবা পেশাগত সংগঠন নয়। তারা ছিলেন একটি নিবন্ধীকরণ পরিষদ অথবা শৃংখলবদ্ধ জনগোষ্ঠী যারা লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গীমহল এবং গ্রাম্য মোল্লা নামে পরিচিত, যাদের কাজ ছিল আরবী ভাষার মাধ্যমে আল কোরানকে উদ্ধৃত করা। সূত্রঃ *Ibid*, p. 263

১৪. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলেমার ভূমিকা*, পৃ. ৫১

১৫. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 294

১৬. *Ibid*, p. 261

১৭. *Ibid*, p. 262

১৮. *Ibid*, p. 265

১৯. *Ibid*, p. 270

২০. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 49

২১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪

২২. C. H. Philips with Co-operation of H. L Singh and B. N. Panday, *The Evolution of India and Pakistan (1858-1947)*, Selected documents, Oxford University press, London. 1962. p. 211

২৩. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 47

২৪. *Ibid*, p. 49

২৫. C. H. Philips, *op. cit.*, p. 210, Satya Pal Anand, *Great Teastaments of India's Freedom Struggle*, Samee Prokashan,Chandigarh,1985, p. 48

২৬. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 49. জালিয়ান ওয়ালাবাগে ১৫০০ জন আহত এবং ৩৭৫ জন মতান্তরে ৫০০ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়। জীবিতদের অনেকেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়। জনসাধারণকে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করে অপমান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নেতাদের জেলে পুরে দেয়া হয় এবং তাদের উপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালানো হয়। এর ফলে জনসাধারণের মাঝে ব্রিটিশ বিরোধী ক্ষোভের সঞ্চার হয়। অপরদিকে সরকারের দমনীতির ফলে জনসাধারণের মনে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। সূত্রঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪, মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ্, *আমাদের মুক্তি সংগ্রাম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃ. ২১৯

২৭. C. H. Philips, *op. cit.*, p. 210

২৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০

২৯. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 49

৩০. শামসুন নাহার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯-২০

৩১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫

৩২. হারুন-অর- রশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬

৩৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫-৬

৩৪. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 294

৩৫. *Ibid*, p. 295

৩৬. Gail Minault, *The Khilafat Movement: Religious Symbolism and Political Mobilization in India*, Oxford University Press, Delhi, 1982, p.74

৩৭. *The Independent* (Allahabad), 25 September, 1919

৩৮. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬

৩৯. *The Leader* (Allahabad), 25 September, 1919

৪০. Gail Minault, *op. cit.*, p. 76

৪১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬

৪২. Gail Minault, *op. cit.*, p. 77

৪৩. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 296

৪৪. গোলাম আহম্মদ মোর্তজা, *চেপে রাখা ইতিহাস*, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশনা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, প্রথম মুদ্রণঃ ১৯৮৬, পৃ. ২৭৮

৪৫. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 296

৪৬. *The Independent* (Allahabad), 12 October, 1919

৪৭. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 296

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. *Ibid*, p. 297

৪৯. *Ibid*, p. 298

৫০. *Ibid*, p. 299

৫১. *Ibid*, p. 300

৫২. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬, আবু আল সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৯, হারুন-অর-রশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭

৫৩. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫

৫৪. *The Independent* (Allahabad), 2 December, 1919

৫৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ নভেম্বর, ১৯১৯

৫৬. *The Independent* (Allahabad), 28 November, 1919, ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭, শামছুন্নাহার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০, শান্তি উৎসব মূলত ছিল মিত্রশক্তির বিজয়ধর্মী সঙ্গী উৎসব। অন্য কথায়; পররাজ্য জয়ের জন্য আনন্দ উৎসব, সূত্রঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

৫৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭

৫৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ নভেম্বর, ১৯১৯

৫৯. Gail Minault, *op. cit.*, p. 74

৬০. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ নভেম্বর, ১৯১৯

৬১. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫

৬২. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ নভেম্বর, ১৯১৯

৬৩. শামছুন নাহার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

৬৪. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 301

৬৫. হারুন-অর-রশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭

৬৬. *Ibid*, p. 302

৬৭. *Ibid*, p. 302

৬৮. *Ibid*, p. 303

৬৯. Gail Minault, *op. cit.*, p. 78

৭০. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

৭১. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫, উপস্থিত উলামাদের মধ্যে ছিলেন, মাওলানা আব্দুল বারী মাওলানা সালামত উল্লাহ ফিরিঙ্গী মহল্ল, মাওলানা মোহাম্মদ আনীস, মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা খাজা নিযামুদ্দীন, পীর ইমাম মোহাম্মদ সিন্ধী, মাওলানা আসাদুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা সাইয়েদ মুহম্মদ ফাখির এলাহাবাদী, মুফতী কিফায়তুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম দরভাঙ্গা, মওলানা মুহাম্মদ খোদা বখশ মুযাফফর পুরী, মাওলানা আব্দুল হাকিম গয়াবী, মওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক, মাওলানা মুহাম্মদ নাউস, মাওলানা মুহাম্মদ সাইয়েদ ইসমাইল, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাওলানা আযাদ সুবহানী। সূত্রঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

৭২. Gail Minault, *op. cit.*, pp. 81-82

৭৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮

৭৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮, ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫

৭৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮-৯

৭৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ নভেম্বর, ১৯১৯

৭৭. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 50

৭৮. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 303

৭৯. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০

৮০. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 304

৮১. *Ibid*, pp. 304-5

৮২. *Ibid*, p. 305

৮৩. প্রনবকুমার চট্টপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪

৮৪. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০

৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৮৬. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 315

৮৭. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 50

৮৮. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১-১২, Gail Minault, *op. cit.*, p. 87

৮৯. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 305

৯০. *Ibid*, p. 306

Dhaka University Institutional Repository

৯১. *Ibid*, pp. 306-7

৯২. *The Independent* (Allahabad), 3 March, 1920

৯৩. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 308

৯৪. আবু-আল-সাঈদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

৯৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২, ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭,

৯৬. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 50

৯৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৯৮. Francis Robinson. *op. cit.*, p. 309

৯৯. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২, ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

১০০. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১০১. *The Independent* (Allahabad), 9 April, 1920

১০২. *The Independent* (Allahabad), 20 and 28 April, 1920

১০৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১০৪. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 309

১০৫. *The Independent*, 9 April, 1920

১০৬. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 310

১০৭. *The Independent*, 8 May, 1920

১০৮. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 310

১০৯. *Ibid*, p. 311, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩, ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

১১০. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 311

১১১. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

১১২. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১১৩. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 50

১১৪. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 312

১১৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩, Santimoy Ray তার *Freedom Movement and Indian Muslims* বইয়ে এলাহাবাদের সভার তারিখ উল্লেখ করেছেন ৯ জুন, ১৯২০

১১৬. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 314

১১৭. *Ibid*, pp. 314-15

১১৮. *Ibid*, p. 315

Dhaka University Institutional Repository

১১৯. *The Independent* (Allahabad), 8 June, 1920

১২০. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 50, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩, ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

১২১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪

১২২. *The Independent* (Allahabad), 3 June, 1920

১২৩. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 316

১২৪. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১২৫. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 316

১২৬. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১২৭. গোলাম আহাম্মেদ মোর্তজা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮

১২৮. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 51

১২৯. গোলাম আহাম্মেদ মোর্তজা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮

১৩০. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 51

১৩১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১৩২. Satyapal Anand, *op. cit.*,, p. 52

১৩৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১৩৪. Francis Robinson. *op. cit.*, p. 316

১৩৫. *সওগাত*, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩৫৫

১৩৬. Dr. L. S. May, *op. cit.*,, p. 249

১৩৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬

১৩৮. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (১৯০৭-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৭

১৩৯. Santimoy Ray. *op. cit.*, pp. 50-51, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ তাঁর "বাঙলায় খিলাফত অসযোগ আন্দোলন" বইয়ে ১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ১৯২০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মওলানা তাজুদ্দীন সিন্দীর সভাপতিত্বে জমিয়ত-এ-উলামার এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৮ সেপ্টেম্বর ৫০০ উলামার স্বাক্ষরসহ অসহযোগের একটি ফতোয়া প্রকাশিত হয়। ফতোয়ায় ভারতে ব্রিটিশের সাথে অসহযোগিতা করা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। তথ্যনির্দেশ: *তাহরীক*, পৃ. ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

১৪০. *Ibid*, p. 51

১৪১. *Ibid*, pp. 51-52

১৪২. *Ibid*, p. 52

১৪৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

১৪৪. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 319

১৪৫. *নবজীবন*, কলকাতা, ৮ আগস্ট, ১৯২০

১৪৬. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, কলকাতা, ২৫ আগস্ট, ১৯২০

১৪৭. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 319

১৪৮. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

১৪৯. *যুগ বিচিত্রা*, পৃ. ১৫১-৫২

১৫০. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

১৫১. Francis Robinson, *op. cit.*, pp. 319-20

১৫২. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, কলকাতা, ৬, ৭, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২০, *The Leader* (Allahabad), 9 September, 1920

১৫৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮

১৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

১৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-১৭

১৫৬. Santimoy Ray, *op. cit.*, p. 52

১৫৭. সালাহউদ্দিন আহম্মেদ, *বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ৭৩

১৫৮. C. H. Philips, *op. cit.*, p. 221

১৫৯. সালাহউদ্দিন আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩

১৬০. আবু-আল-সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮

১৬১. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 289

১৬২. সালাহউদ্দিন আহম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩

১৬৩. Santimoy Ray, *op. cit.*, p. 54, C. H. Philips, *op. cit.*, p. 221

১৬৪. সালাহউদ্দিন আহম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭

১৬৫. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 326

Dhaka University Institutional Repository

১৬৬. *Ibid*, p. 327

১৬৭. *The Leader* (Allahabad), 12 September, 1920

১৬৮. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 323

১৬৯. *Ibid*, p. 324

১৭০. *Ibid*, p. 325

১৭১. *Ibid*, p. 326

১৭২. *যুগ বিচিত্রা*, পৃ. ১৫১-১৫২

১৭৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

১৭৪. *যুগ বিচিত্রা*, পৃ. ১০৯

১৭৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

১৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০

১৭৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

১৭৮. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 328

১৭৯. গোলাম আহাম্মেদ মোর্তজা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৮

১৮০. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 327

১৮১. *Ibid*, p. 328

১৮২. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১

১৮৩. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 59

১৮৪. আবু আল সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮০

১৮৫. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 55

১৮৬. *Ibid*, p. 58

১৮৭. *Ibid*, p. 59

১৮৮. *Ittihad* (Amroha), 1 April, 1921

১৮৯. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১

১৯০. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 330

১৯১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১

১৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

১৯৩. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 330

১৯৪. *Ibid*, p. 331

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২

১৯৬. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 331

১৯৭. গোলাম আহাম্মেদ মোর্তজা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮০

১৯৮. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩

১৯৯. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 331

২০০. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩

২০১. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 332

২০২. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩, ইমতিয়াজ আহমেদ তাঁর এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, "বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকা", ১৮০ পৃষ্ঠায় ভারতে প্রিন্স অব ওয়েলস এর আগমনের তারিখ ১৮ নভেম্বর ১৯২১ উল্লেখ করেছেন।

২০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

২০৪. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 332

২০৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪

২০৬. *The Leader* (Allahabad), 4 January, 1922

২০৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪

২০৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪-২৫

২০৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

২১০. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 332

২১১. *Ibid*, pp. 332-333

২১২. *Ibid*, p. 333

২১৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫, Satyapal Anand এর Great Teastments of India's Freedom Struggle বইয়ে ৫৫ পৃষ্ঠায় ভাইসরয়ের নিকট গান্ধীজির নোটিশ উল্লেখ না করে "খোলা চিঠি" উল্লেখ করেছেন এবং তারিখ উল্লেখ করেছেন ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২

২১৪. Satyapal Anand, *op. cit.*, p. 55

২১৫. *Ibid*, p. 57

Dhaka University Institutional Repository

২১৬. Francis Robinson, *op. cit.*, pp. 332-333, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ তাঁর "বাঙলায় খিলাফত-অসযোগ আন্দোলন" বইয়ের ২৫ পৃষ্ঠায় আগুনে পুড়ে মৃত পুলিশের সংখ্যা ২২ জন উল্লেখ করেছেন। তথ্যনির্দেশ: *সীরাত*, ৩৯-৪০

২১৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫

২১৮. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 333

২১৯. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫

২২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

২২১. গোলাম আহাম্মেদ মোর্তজা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮০

২২২. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 333

২২৩. *Ibid*, p. 334

২২৪. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬

২২৫. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 334

২২৬. গোলাম আহাম্মেদ মোর্তজা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮০

২২৭. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 334

২২৮. *Ibid*, p. 335

২২৯. *Ibid*, p. 336

২৩০. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬

২৩১. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 336

২৩২. *Ibid*, p. 336-37

২৩৩. *The Leader* (Allahabad), 8 April, 1923

২৩৪. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 337

২৩৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬

২৩৬. *The Leader* (Allahabad), 20 January, 1923

২৩৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬

২৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

২৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

২৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

একনজরে বাংলার প্রতিক্রিয়া

বাঙালী মুসলমান জনসাধারণ যাঁরা এতদিন রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন তাঁরা এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে খিলাফত আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে পরিণত করলেন।[১] খিলাফত আন্দোলনে বাঙালী সাধারণ মুসলমানগণই সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেন। তাই কিছুদিনের জন্য হলেও খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালী মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরা ধর্ম নিরপেক্ষতার দিকে ধাবিত হতে সক্ষম হন।[২]

১৯২০ সালের প্রথম দিকে বাংলার মুসলিম রাজনীতিকগণ সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির প্রাদেশিক শাখা স্থাপনে তৎপর হয়ে উঠেন। তাই তাঁদের উদ্যোগেই গঠিত হয় বঙ্গীয় খিলাফত কমিটি। মাওলানা আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে[৩] গঠিত কমিটির সভাপতি হন মওলানা আবুল কালাম আজাদ, সহ-সভাপতি হন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সাধারণ সম্পাদক হন মওলানা আকরাম খাঁন এবং সহ-সম্পাদক হন মৌলভী মুজিবুর রহমান ও যশোরের এডভোকেট মজীদ বখ্‌শ। কলকাতার কলুটোলা স্ট্রীটের হিরণবাড়ী লেনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়[৪] এবং প্রতিটি জেলা শহরে খিলাফত কমিটির শাখা বিস্তার করে। এ কমিটিগুলো কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সাথে সমান্তরালভাবে গড়ে উঠে। খেলাফতীগণ জেলা ইসলামীয়া আঞ্জুমানগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণেও তৎপর দেখায় এবং বহু মোল্লার সমর্থনে তাদের স্বধর্মালম্বীদের মধ্যে একটি নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ কাঠামো গড়ে তুলেন।[৫]

১৯২০ সালের ২৮ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার টাউন হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির উদ্যোগে খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৬] কলকাতার এ সম্মেলনে এত বিশাল সমাগম এবং মুসলমানদের মধ্যে হৃদ্যতাবোধ আর কখনো দেখা যায়নি। বিভিন্ন সমিতি, জেলা সমূহ এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় একশত প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং কিছু হিন্দু প্রতিনিধি ও যোগদান করেন। যোগদানকারীদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন – মি. মুশীর হুসাইন কিদওয়াই, মওলানা আব্দুল বারী, মওলানা হসরত মোহানী, এ. কে. ফজলুল

Dhaka University Institutional Repository

হক, মৌলভী নাজমুদ্দীন আহমেদ, মৌলভী আবুল কাশেম, মি. সাআদুল্লাহ্ (আসাম), মৌলভী মুজিবর রহমান, মি. মওদুদুর রহমান, মৌলভী আবদুল গনি (মালদহ), মি. জি. এইচ. ও. আরীফ, বাবু সত্যেন্দ্র বৌস, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রায়কুণ্ডলাল সিং, মৌলভী গোলাম আহমদ (আলিপুর),বাবু পিজুশ কান্তি ঘোষ, মৌলভী রফিক আহমদ (হাওড়া), চৌধুরী মুহম্মদ ঈসা বি. এল, বাবু ভোলানাথ বর্মন, মৌলভী সৈয়দ মজীদ বখ্শ (যশোর), মৌলভী আব্দুল হামিদ বি. এল. (সিলেট), মৌলভী আব্দুল্লাহেল বাকী (দিনাজপুর), খানবাহাদুর মৌলভী আব্দুছ ছালাম, মৌলভী ইয়াকীনুদ্দীন (দিনাজপুর), মৌলভী ওজীহ উদ্দীন আহমদ, মি.ফজলে ইলাহী, মি. শায়খ ইখলাস আহমদ, মৌলভী আমীরুদ্দিন আহমদ, মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মৌলভী নজীর উদ্দিন আহমদ এম. এ. বি. এল, হাশেম আলী খান (বরিশাল), উকিল মৌলভী মোঃ আব্দুল হাই, মৌলভী ইক্রামুল হক (ব্রহ্মপুর), মৌলভী আকবর আলী (সিরাজগঞ্জ), মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ, বি. এ. (নদীয়া) ও মি. জি. এইচ. মল। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন মওলানা শওকত আলী ও ডঃ সায়ফুদ্দীন কিচলু। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন মওলানা হাকীম আব্দুর রউফ দানাপুরী এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির ভাষনে উল্লেখ করেন যে, তিনি ১০/১২ বছর ধর্মীয় কাজে ব্যয় করেছেন তাই তিনি খিলাফত প্রশ্নে এবং দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে নিশ্চুপ থাকতে পারেনি বিধায় বঙ্গীয় খিলাফত কমিটির সদস্যদের অনুরোধে এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে সম্মত হন। তিনি তাঁর ভাষণে খিলাফতের মহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেন। পরিশেষে তিনি বলেন, যদি অবস্থার পরিবর্তন না হয় এবং ব্রিটিশ সরকার খিলাফত সমস্যার সমাধান না করেন, তবে কুরআনের মর্মানুসারে মুসলমানদের জন্য অসহযোগ আন্দোলন ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।[৭]

২৮ ফেব্রুয়ারির সভায় গৃহীত প্রস্তাব :

"তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পর্কে কান্টারবারির আর্ক-বিশপ এবং অন্যসকল খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও রাজনৈতিক বিশারদগণ যেসব মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, হিন্দু মুসলমানদের এই সভা দৃঢ়ভাবে এবং অবজ্ঞাভরে তার নিন্দা করছে এবং দায়িত্বপূর্ণ সকল কর্তৃপক্ষের নিকট স্পষ্ট ও জোড়ালো

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় ঘোষণা করছে যে, তুরস্কের সাথে অনুষ্ঠেয় সন্ধিচুক্তি যদি ধর্মের বিধান ও ইসলামের দাবীসমূহের বিরোধী হয়, অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে খলিফার রাজ্য যেরূপ অখণ্ড ছিল, যদি সেরূপ অখণ্ড রাখা না হয়, তবে ইসলামের নীতি অনুসারে মুসলমানগণ গ্রেট ব্রিটেনের সাথে রাজভক্তির সকল প্রকার সমন্ধ পরিহার করতে বাধ্য হবেন এবং তাঁদের খলিফার শত্রুদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে যত রকমে সম্ভব, খলিফাকে কর্তব্যবোধে সাহায্য করতে বাধ্য হবেন।"

২৯ ফেব্রুয়ারি সভার গৃহীত প্রস্তাবসমূহ :-

প্রথম প্রস্তাব:- " এই সভা ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করছে যে, পূর্ববর্তী তুর্কী সুলতানগণ যেমন ইসলামের খলিফা ছিলেন, বর্তমান সুলতান ও সেইরূপ খলিফা বলে পরিগণিত হবেন এবং তিনি যে মুসলমান জগতের ধর্মগুরু তা-ও এই সভা ঘোষণা করছে।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব:- "খিলাফত ধ্বংসের জন্য, নির্দয়ভাবে তুর্কী সাম্রাজ্য হতে সাম্যনীতি, ন্যায়পরায়নতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা উচ্ছেদের জন্য এবং আন্তর্জাতিক সকল ন্যায়নীতি লংঘন করে ইংল্যান্ড ও তার মিত্রগণ তুরস্ককে টুকরো টুকরো করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যেসব চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে এই সভা গভীর ঘৃণা ও বিক্ষোভ প্রকাশ করছে।"

তৃতীয় প্রস্তাব:- "শান্তি সংসদের আগামী অধিবেশনের সিদ্ধান্তে তুর্কী সাম্রাজ্যকে যদি কোন রকমে বিভক্ত করা হয়, জাজিরাতুল আরব ও অন্যান্য অঞ্চলের পবিত্রস্থানগুলোকে যদি মুসলমানদের প্রয়োজন উপেক্ষা করে এবং বিগত ১৪/১৫ মাস যাবৎ তাঁরা যেসব ওয়াদা করে আসছেন, তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন শক্তির শাসনাধীনে বা প্রভাব প্রতিপত্তির অধীনে স্থাপন করা হয়, তবে যত রকমে সম্ভব, খিলাফত অক্ষুন্ন রাখা ও মুসলিম খলিফার পদমর্যাদা ও গৌরব রক্ষা করা মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য (ফরজ) হয়ে পড়বে বলে এই সভা ঘোষণা করছে।"

চতুর্থ প্রস্তাব:- " মিশর মুসলমান সাম্রাজ্যের অংশ। কাজেই গ্রেট ব্রিটেন মিশরের উপর শাসন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যে ঘোষণা দিয়েছে, ভারতের মুসলমানগণ সেই ঘোষণার নিন্দা করছেন এবং মিশরবাসীদের স্বাধীনতার যে জন্মগত অধিকার আছে, সেটা হতে তাঁদের বঞ্চিত

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য ব্রিটিশ সরকার যেসব চেষ্টা করছেন, তাতে ভারতের মুসলমানগণ দুঃখ প্রকাশ করছেন।"

সন্ধ্যায় নামাজের জন্য সভা মুলতবির পর রাত ৭.৩০ মিনিটে পুনরায় সভা আরম্ভ হয় এবং এ. কে ফজলুল হক প্রস্তাব করেন যে,

পঞ্চম প্রস্তাব:- "খিলাফত ও মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলো সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত চেষ্টা করা হয়েছে, তা নিষ্ফল হওয়ায় এবং তুর্কীদের ইস্তাম্বুল হতে তাড়িয়ে দেয়া হবে, তদুপরি ইস্তাম্বুল ও আদ্রিয়ানোপল হতে খলিফার শাসন উঠিয়ে দেয়া হবে– এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় মুসলমানদের পক্ষে সমস্যার প্রতিকারের লক্ষ্যে নিম্নের প্রাথমিক কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা ব্যতীত আর গত্যন্তর নেই বলে এই সভা মত প্রকাশ করছে:

ক) আগামী ১৯ মার্চ শুক্রবার দিনটিতে মুসলমানদের সকল কাজ বন্ধ রাখতে হবে। বড়লাট ও সম্রাটের নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাতে হবে যে, খিলাফত, জাজিরাতুল আরব ও মুসলমানদের ধর্মীয় স্থান সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমানদের দাবী ও শরীয়তের পরিপন্থী কোন কাজ করা হলে ধর্মীয় বিধান মত তাঁদের পক্ষে পার্থিব রাজভক্তি অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হবে না।

খ) শরিয়তের আদেশের বশবর্তী হয়ে এই সভা সম্রাটের অধীন মুসলমান সৈন্যদের নিকট এই আবেদন করছে যে, তাঁরা যেন নিজ নিজ সেনাদলের অফিসারদের এ মর্মে অবহিত করেন যে, মুসলিম জাতির আবেদনের প্রতিকূলে যদি ঐ বিষয়গুলোর মীমাংসা হয়, তবে ইসলামের আদর্শানুযায়ী ব্রিটিশ সরকারের সাথে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করা তাঁদের কর্তব্য হয়ে পড়বে এবং তাঁরা যদি তা করতে অসমর্থ হন, তবে তাঁরা সমাজচ্যুত হবেন।

গ) এই বিষয়ে হিন্দু ভাইগণ মুসলমানদের সাহায্য করবেন বলে এই সভা আশা করছে।

ঘ) এই সভা ভারতের মুসলমান সামন্ত রাজগণের নিকট ও তাঁদের প্রজাগণের নিকট আবেদন করছে যে, উক্ত সিদ্ধান্তের জন্য তাঁরা যেন চেষ্টা করেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব :- "এই সভা ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সব মুসলমান সদস্য এবং সমস্ত অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে তাঁদের চাকুরী বর্জন এবং উপাধিধারীদেরকে তাঁদের উপাধি প্রত্যাখানের জন্য অনুরোধ করছে এবং আরো অনুরোধ করছে, তাঁরা যেন মান্যবর এ.

Dhaka University Institutional Repository

কে. ফজলুল হক ও মৌলভী আবুল কাশেমের পথ অনুসরণ করে ব্রিটিশ সরকারকে কর্মবর্জন ও উপাধি প্রত্যাখানের সংবাদটি জানিয়ে দেন।"

এরপর সভাপতি কর্তৃক আরো দুটি প্রস্তাব উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে বিলাতি পণ্য বর্জনের নির্দেশ ছিল এবং ১৯ মার্চ সমগ্র দেশব্যাপী হরতাল সহ খিলাফত দিবস পালনের নির্দেশ ছিল।[৮]

কলকাতার খিলাফত অধিবেশন আন্দোলনের পক্ষে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল। যদিও ঐ অধিবেশনটি ছিল শুধু প্রাদেশিক বিষয়। ঐ অধিবেশনে খিলাফতীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলা হয়েছিল যে, তাঁরা হয় আন্দোলনে থাকবে অথবা বিরুদ্ধে চলে যাবে। তাঁদের নেতৃত্বের উদ্যোগ ছিল খুবই স্বার্থক। গান্ধীজি তাঁদের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। তিনি বয়কট সিদ্ধান্ত ঠেকাতে অক্ষম ছিলেন। মূলত তাঁকে উক্ত বিষয়টি মেনে নিতে হয়েছিল এ কারণে যে, তাঁর অসম্মতিটাকে উপেক্ষা করে সমগ্র কলকাতায় ইহা জারী করা হয়েছিল। উক্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের ধ্বনি তিনি অনুধাবন করেছিলেন। সম্মেলনের এক সপ্তাহ পরে খিলাফত আন্দোলনের উপর তিনি একটি নতুন প্রস্তাব আনলেন। তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন যে, কোন সহিংসতা, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন চলবেনা এবং অন্য প্রশ্নের সাথে খিলাফত নিয়ে কোন সংশয় থাকবে না। তিনি ১৯ মার্চ ১৯২০ এর হরতালকে সমর্থন দিয়েছিলেন এ ঘোষণার মাধ্যমে যে, যদি মুসলমানদের দাবী মেনে নেয়া না হয় তাহলে অসহযোগ আন্দোলনই হবে শ্রেয়। যদিও এসব বিষয়গুলো তিনি ইতিপূর্বেই বলেছিলেন।[৯]

১৯২০ সালের ৩ মার্চ প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকার আহসান মঞ্জিলে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ঐ সম্মেলনের আয়োজকদের মাঝে নেতৃত্বে ছিলেন আইন কলেজের ছাত্র ইব্রাহীম সাহেব, তরুণ নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ প্রমুখ। হাবিবুল্লাহ ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান।[১০] ইব্রাহীম সাহেব ভলান্টিয়ারদের নেতৃত্ব দেন। আবুল মনছুর আহাম্মেদ সাহেব তখন ঢাকা কলেজের বি. এ. ক্লাশের ছাত্র। তিনি তখন ভলান্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

ঐ সম্মেলনে দেশ বরেণ্য খিলাফত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা আকরাম খান, মৌলভী মুজিবর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ঐ সভা কলকাতার টাউন হলের সভার প্রস্তাবলী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে। মওলানা আকরাম খান সভায় খিলাফত আন্দোলনে অসহযোগের প্রয়োজনীতা ব্যাখ্যা করে বাংলাভাষায় তেজদৃপ্ত বক্তৃতা করেন।[১২] মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী খিলাফত আন্দোলনের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। তিনি বলেন যে,

> "প্রতিবেশীর বিপদে সাহায্য করা কর্তব্য, ইহা অনেক হিন্দু বলিতেছেন; কিন্তু ইহা কিয়ৎ পরিমাণে হিন্দুরও বিপদ বটে। প্রবল বলশেভিক বিভীষিকার ফলে রিফর্মএ্যাক্ট পার্লামেন্টে রাতারাতি পাশ হইয়া গেল। যদি এশিয়ার স্বাধীন রাজ্যসমূহ লোপ পায়, তবে ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতা বর্জিত এশিয়া ভূমিরই একাংশরূপে পূর্ণ "স্বায়ত্বশাসন" লাভ করার আশা করা বামন হইয়া চাঁদ ধরার চেষ্টার ন্যায় বাতুলতা মাত্র। তুরস্ক লোপ পাইলে, লুপ্তপ্রায় পারস্যের লোপ ধ্রুব। তুরস্ক ও পারস্যের লোপের পর কাবুলের স্বাতন্ত্র্য থাকিতেই পারেনা। সুতরাং তদবস্থায় প্রতিকূল বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া অনুকূল স্বায়ত্বশাসন লাভ হইতেই পারেনা।"

মনিরুজ্জামান সাহেবের এ আন্তরিক আবেদনের ফলে সভা স্থলেই দুই হাজার টাকা সংগৃহীত হয়।[১৩]

১৯২০ সালের ১৯ মার্চ কলকাতার সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতের সর্বত্র যেমন দ্বিতীয় খিলাফত দিবস পালিত হয়, তদ্রুপ কলকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হরতাল সহ খিলাফত দিবস পালিত হল এবং খিলাফত বিষয়ক সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনেক মুসলমান ঐ দিন রোযা সহ নফল নামাজ আদায় করেন। হরতালে হিন্দুরাও অংশগ্রহণ করেন।[১৪]

১৯২০ সালের ৩ এপ্রিল মেদিনীপুরে এ. কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ড ও মিত্রশক্তি জোট তুরস্কের প্রতি যে আচরণ করেছে তার ন্যায্যতা ও যথার্থতা হিসেবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ উল্লেখ করলে ফজলুল হক ঐ কনফারেন্সে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, খিলাফত প্রশ্নের সাথে মুসলমানরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তবে মুসলমানদের প্রতিবেশী বলে, হিন্দুরাও এর সাথে

Dhaka University Institutional Repository

কম সম্পৃক্ত নয়। এই ইস্যুতে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ কি মন মানষিকতা পোষণ করেন, তা উভয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করতে হবে। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে,

> "With the question of Khilafat, it is the Moslem who is primarily concerned. The Hindu is no less concerned as a neighbour of the friend and brother of his Moslem countrymen; but both are equally concerned in taking not of the mentality of British statesman towards a question about which Indians of all communities have shown an unmistakable solitude."[১৫]

১৯২০ সালের ১২ জুন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে কলকাতায় ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ডের রিপোর্ট প্রদানের জন্য "হান্টার তদন্ত কমিটি" যে রিপোর্ট দিয়েছিল তাতে ন্যায় বিচারের কোন নির্দেশ এবং দায়ী কর্মকর্তাদের শাস্তির সুপারিশ না থাকায় রিপোর্টটির নিন্দা করা হয়।[১৬]

১৯২০ সালের ১ ও ২ জুনের এলাহাবাদ সম্মেলনে যে কর্মসূচী গৃহীত হয় তাতে বাংলার মুসলিম রাজনৈতিকগণ স্বাগত জানায় এবং তাদের মুখপত্র "The Musalman" ও সাপ্তাহিক "মোহাম্মদী" পত্রিকা দুটি ঐ কর্মসূচীর প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং অবিলম্বে তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানায়।[১৭] এমতাবস্থায় সারা ভারতের ন্যায় কলকাতা সহ সমগ্র বাংলায় ১ আগস্ট হরতালের মাধ্যমে তৃতীয় খিলাফত দিবস পালনের জন্য রাজনীতিকগণ প্রাচীর পত্র এবং ইশতিহার প্রকাশ ও বিতরণ করেন। ঐ সময় বঙ্গীয় খিলাফত কমিটির সাধারণ সম্পাদক মওলানা আকরাম খান এর লিখিত "কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দাও" শীর্ষক ইশতিহারটি প্রকাশনার কারণে সরকার প্রেসএ্যাক্ট লংঘনের অভিযোগে তাৎক্ষণিকভাবে বেআইনী ঘোষণা করেন এবং তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা "মোহাম্মদী" ইশতিহারটি ছাপানোর কারণে পত্রিকাটির জামানত বাজেয়াপ্ত করেন। এছাড়া এ. কে. ফজলুল হকের "নবযুগ" পত্রিকার যে সংখ্যায় ইশতিহারটি ছাপা হয় সে সংখ্যাটিও বাজেয়াপ্ত করেন।[১৮] এরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কলকাতাসহ সারা ভারতে তৃতীয় খিলাফত দিবস হরতাল সহকারে পালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ সালের ৪-৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব করলে তুমুল বিতর্কের পর তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৯] প্রস্তাবটির মূল অংশ ছিল,

> "The congress is of opinion that there is no course left open for the people of India but to approve of and adopt the policy of progressive non-violent non-co-operation inaugurated by Mr. Gandhi until the wrongs are righted and swarajya is established."[২০]

৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অধিবেশনে মহম্মদ আলী জিন্নাহ সভাপতির ভাষণে বলেন, যদি ব্রিটিশ সরকার তুরস্ক সুলতানের প্রতি সুবিচার না করেন এবং খিলাফত প্রশ্নের সুরাহা না করেন, তবে মুসলমানদের পক্ষে অসহযোগ আন্দোলন করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নাই। তাঁর ভাষায়,

> "Yet I would still ask the Government not to drive the people of India to desperation or else there is not other course left open to the people except to inaugurate the policy of non-co-operation (hear, hear and applause) though not necessarily the programme of Mr. Gandhi (no, no)."[২১]

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি ও জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ এর বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। চূড়ান্তভাবে অসহযোগের কর্মসূচী গৃহীত হবার পর বাংলার মুসলমান রাজনীতিকগণ এ কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং তা প্রচারের জন্য বাংলার বিভিন্ন অংশে খিলাফত সভার অনুষ্ঠান শুরু করেন। ১৯২০ সালের ৬ অক্টোবর ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এক ছাত্র সমাবেশে শিক্ষার্থীদের এরূপ শিক্ষা গ্রহণের জন্য গুরুত্বারোপ করেন যে, যার মাধ্যমে তাঁরা নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারেন। মাওলানা আকরাম খানও ঐ সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় খ্রিষ্টান শাসন থেকে ইসলামের মুক্তির জন্য সর্বাগ্রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনকেই আবশ্যকীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং খিলাফত

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন ও কংগ্রেস পরিচালিত "স্বরাজ"[২২] আন্দোলনের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন।[২৩]

সভা-সমাবেশ ছাড়াও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাখ্যাদান করেন। এ উদ্দেশ্যে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী "আল-এসলাম" পত্রিকায় কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি খিলাফতের উপর গুরুত্বারোপ করে "খেলাফৎ" শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধে বলেন যে,

> "পবিত্র স্থান সমূহ এবং আরব রাজ্য খলিফার হাতছাড়া হইলে, রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে বিজাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে খলিফার পদমর্যাদা থাকে না, খলিফার পদমর্যাদা না থাকিলে তিনি খলিফারূপে থাকিতে পারেন না, খলিফা না থাকিলে, এনাম নির্দিষ্ট না থাকিলে মোছলমানের মোছলমানী থাকে না, এছলাম কাএম থাকেনা, জুমআ, জুমআৎ, ঈদ ও হজ্জ ইত্যাদিতে খলিফা বা তাঁহার প্রতিনিধির উপস্থিতি বা অনুমতির প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত যে সকল ধর্ম কর্ম কিছুই থাকিতে পারেনা। অতএব এছলাম রক্ষা করিতে হইলে, মোছলমান নামে অভিহিত হইতে হইলে, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদের উম্মতের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকিতে খলিফাকে রক্ষা করা, খলিফার রাজ্য, তাঁহার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা রক্ষা করা, প্রত্যেক মোছলমানের ফরজ। যাহারা খলিফার পদমর্যাদা, এমামের পদ গৌরব রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে না, তাহারা মোছলমান নামে পরিচিত হইতে পারিবে না।"

তাছাড়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অসহযোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁর "ঈমানের পরীক্ষা সরকারের সাহচর্য্য ত্যাগ" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে,

> "বিজাতি বিধর্মী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যাহারা মোছলমানদের সহিত কোনরূপ ঝগড়া বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত নহে, মোছলমানের অনিষ্টসাধন করিতে, তাহাদের রাজ্য রাজত্ব হস্তগত করিতে এছলাম ধর্মে আঘাত করিতে উদ্যত নহে বরং শান্তির সহিত পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে অভ্যস্ত তাহাদের সহিত সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিতে, সদ্ব্যবহার ও সাহচার্য করিতে এছলাম ধর্মে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু বিধর্মী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা মোছলমানদের স্বার্থে আঘাত করিতে অথবা মোছলেম রাজ্য ধ্বংস বা অধিকার করিতে, মোছলমানের পবিত্র স্থান সমূহ জয় করিতে,

Dhaka University Institutional Repository

এছলাম ধর্মের অবমাননা করিতে, মোছলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অগ্রসর হয়, সেরূপ জাতির সহিত মিলামিশা করা, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করা, তাহাদের কোন কাজে সহযোগিতা ও সাহচয্য করা নিষিদ্ধ ও মহাপাপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।"

তিনি তাঁর "অসহযোগিতা ও আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক নিবন্ধে লিখেন যে, "এই অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য দুইটি, খেলাফত সমস্যার সমাধান, তুরস্ক সুলতানের হৃতরাজ্য সমূহের পুনরুদ্ধার, এছলাম জগতের খলিফার পদমর্যাদা রক্ষা করা। ২য়টি ভারতে স্বরাজ লাভ।"[২৪]

অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে তিনি একই নিবন্ধে আরও মত প্রকাশ করেন যে, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতাই হল সবচেয়ে বড় কার্যকরী অবলম্বন। এতে একদিকে যেমন ইংরেজদের ক্ষমতা লোপ পাবে, অন্যদিকে তেমনি ভারতবাসী তাদের ন্যায় সঙ্গত ও ধর্মানুমোদিত দাবী আদায় করতে সক্ষম হবেন। তাই অসহযোগ আন্দোলনে প্রত্যেক ভারতবাসীকেই যোগদান করা কর্তব্য।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ছাড়াও বাংলার অনেক রাজনীতিক, কবি, সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক অসহযোগ আন্দোলনকে জাতীয় ইস্যুতে রূপ দেওয়ার জন্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইসমাইল হোসেন শিরাজীও "ছোলতান" পত্রিকায় "হিন্দু-মোছলমান" শিরোনামে প্রবন্ধের মাধ্যমে খিলাফত ও পবিত্র ভূমির পবিত্রতা রক্ষার জন্য ভারতের মুক্তি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও মত প্রকাশ করেন যে, ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হলে পবিত্র স্থান ও মুসলিম রাজ্য সমূহ কখনো নিরাপদ হতে পারেনা। স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দুদের স্বার্থই উদ্ধার হবে বলে অনেক মুসলমান যে ধারণা করেন, তিনি তাঁর প্রবন্ধে তা অলীক বলে মন্তব্য করেন।[২৫]

অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার বিধি অনুসারে ১৯২০ সালে ডিসেম্বরে প্রথমদিকে বঙ্গের প্রথম ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে এ. কে. ফজলুল হক, মজীদ বক্স তাঁদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন।[২৬]

একই সময় ঐ আন্দোলনের অংশ হিসেবে সরকারী অফিস-আদালত, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের কার্যক্রম শুরু হয়। মনিরুজ্জামান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী মাওলানা আকরাম

Dhaka University Institutional Repository

খান ঢাকা ও চট্টগ্রামে বহু সভা-সমাবেশ করেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় বাংলায় সরকারী বিদ্যালয় বর্জনের আন্দোলন শুরু হয় ও প্রসার লাভ করে।[২৭]

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুরের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশনে গান্ধীজির অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হবার পর খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সম্মিলিত রূপ পরিগ্রহ করে।[২৮] ঐ আন্দোলনের অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন নব উদ্দীপনায় শুরু হয় এবং পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা শহরে মুসলমান ছাত্ররা ঐ কর্মসূচীতে ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন।[২৯] এতে দেশবরেণ্য রাজনীতিকদের রাজনৈতিক আদর্শ এবং কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক ছাত্র প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এম. এ. ক্লাশের ছাত্র জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম।[৩০]

সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের প্রেক্ষিতে অসহযোগের নেতারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন।[৩১] এর প্রেক্ষিতে ১৯২০ সালের ১৩ ডিসেম্বর কলকাতার মাদ্রাসার বিকল্প স্বরূপ আবুল কালাম আজাদের উদ্যোগে একটি জাতীয় আরবি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসার উদ্বোধন করেন মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী এবং আবুল কালাম আজাদ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। ঐ মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী। মাদ্রাসার ছাত্রনেতা নাসীর আহমদ-এর নেতৃত্বে ২৫০ জন ছাত্র কলকাতা মাদ্রাসা ত্যাগ করেন।[৩২] কলকাতা মাদ্রাসা সংলগ্ন ওয়েলেসলী স্কোয়ারে "দি মুসলমান" পত্রিকার সম্পাদক মজিবর রহমানের সভাপতিত্বে এক জনসভায় মওলানা মুহাম্মদ আলী কলকাতাসহ ভারতের সকল ছাত্রকে অবিলম্বে স্কুল-কলেজ বর্জনের মধ্যদিয়ে অসহযোগ আন্দোলনকে তীব্র করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানের প্রেক্ষিতে মাদ্রাসার ছাত্রদের ক্লাশ বর্জনের পাশাপাশি স্কুলের ছাত্ররাও ধর্মঘটে যোগদেন। এটাই ছিল কলকাতার প্রথম ছাত্র ধর্মঘট।[৩৩]

মওলানা মনিরুজ্জামানের সহায়তায় "আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙালা" এর চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে চট্টগ্রামে "এছলামাবাদ জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়" নামে একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। জনাব মনিরুজ্জামান ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি। তিনি "আল্ এছলাম" পত্রিকায় "এছলামাবাদ জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়" শিরোনামে এক নিবন্ধে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত ঐ বিদ্যালয়ে পাঠ্য প্রণালীও প্রণয়ন করেন। জানা যায় ঐ প্রতিষ্ঠানটি ছিল বাংলার অসহযোগ আন্দোলনকারীদের দ্বারা স্থাপিত প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়।[৩৪] এছাড়াও ময়মনসিংহ জেলার বৈলর বাজারেও অনুরূপ একটি জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আবুল মনসুর আহমদ এর হেড মাস্টার এবং আবুল কালাম শামছুদ্দীন এর এসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার নিযুক্ত হন।[৩৫]

১৯২০ সালের ডিসেম্বরের নাগপুর ছাত্র কনফারেন্সের গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ছাত্র বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। প্রথমে বিদ্রোহ দেখা দেয় বঙ্গবাসী কলেজে। তাঁরা কলেজ কর্তৃপক্ষকে কলেজটি জাতীয় করণের জন্য নোটিশ দেয় এবং সরকারের সাথে এর সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবী জানায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ না করায় ১২ জানুয়ারি, ১৯২১ ছাত্ররা ক্লাশ থেকে বেরিয়ে পড়ে মিছিল করে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে থাকে এবং অন্যান্য কলেজের ছাত্রদের ধর্মঘটে যোগ দেয়ার জন্য আহ্বান করেন। তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রিপন কলেজের সব ছাত্র এবং সিটি কলেজের প্রায় অর্ধেক ছাত্র রাস্তায় নেমে পড়েন। প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র মির্জাপুর স্কোয়ারে জমায়েত হন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ওয়াহিদ হুসাইন, সি. আর. দাস ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা ছাত্রদের সম্বোধন করে বক্তৃতা দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি উৎসাহিত করেন।[৩৬] এর দুদিন পর বিদ্যালয় বর্জন আন্দোলন আরো অগ্রসর হয়। ঐ দিন মির্জাপুর পার্কের সভায় প্রায় চৌদ্দ হাজার ছাত্রের সমাবেশ হয়। ঐ সভায় চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পি. ব্যানার্জী সহ অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন মৌলভী মুজিবর রহমান। ঐ দিন বঙ্গবাসী কলেজে ৪ জন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। রিপন কলেজে অধিকাংশ অনুপস্থিত। সিটি কলেজেও তাই হয়েছিল। বিদ্যাসাগর কলেজে অনেকে যায়নি। স্কটিস চার্চ কলেজে অর্ধেক ছাত্র অনুপস্থিত। ঐ দিন বিকেল ৪টায় মির্জাপুর স্কোয়ারে মওলানা আকরাম খানের সভাপতিত্বে বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ স্কোয়ারে দুই হাজার ছাত্রের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিপিনচন্দ্র পাল। সিটি কলেজেও আরেকটি সভা হয়।[৩৭]

১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে ছাত্র ধর্মঘট চরম আকার ধারণ করে। ১৬ জানুয়ারি কলকাতায় ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করেন এবং সভা-সমাবেশ করেন। এতে বিপিনচন্দ্র পাল

Dhaka University Institutional Repository

অসহযোগের পক্ষে বক্তব্য রাখেন।[৩৮] ১৭ জানুয়ারি ছাত্রদের ধর্মঘট পুরোমাত্রায় চলে। ঐ দিন সকাল ১০ টায় ইডেন গার্ডেনে ছাত্রদের এক সভা হয়। সভাপতি ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি ৭টি বড় বড় সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি ছিলেন ছাত্রদের প্রধান নেতা। তাঁর অধীনে দশ হাজার ছাত্র ধর্মঘট করেন। ১৮ জানুয়ারি সভা-সমিতিসহ ধর্মঘট অব্যাহত থাকে।[৩৯] ১৯ জানুয়ারি কলকাতার একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ব্যারিস্টার সি.আর. দাস আন্দোলনের জন্য তাঁর আইন পেশা ত্যাগ করেন এবং তাঁর বিশাল অর্থ-সম্পদ আন্দোলনের জন্য উৎসর্গ করেন।[৪০] কলকাতার কয়েকটি স্কুলেও ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্র ধর্মঘটের কারণে স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষ কয়েকটি স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখেন। ২০ জানুয়ারি মিঃ দাস, মিঃ চক্রবর্তী, আবুল কালাম আজাদসহ কয়েকজনের নেতৃত্বে গ্রাম সংগঠনের জন্য একটি অসহযোগ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এতে নৈশ স্কুল, গ্রামীন ব্যাংক, সমবায় ইত্যাদি স্থাপনের কর্মসূচী গৃহীত হয়।[৪১]

২৩ জানুয়ারি কলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর আগমনে বর্জন আন্দোলন আরো জোড়ালো হয়। তাঁর আগমনে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও যোগদান করেন।[৪২] ঐ দিন গান্ধীজি দশ হাজার ছাত্রের সমাবেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে যাঁরা অর্থাৎ যেসব শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক তখন পর্যন্তও আন্দোলনে যোগ দেন নি তাঁদের নিন্দা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় স্বরাজ এর কথাও বলেন। তিনি বলেন, প্রথমে স্বরাজ পরে শিক্ষা।[৪৩] ৩১ জানুয়ারি কলকাতার স্টার থিয়েটার হলে কলকাতার পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ ও আইন কলেজের ছাত্রদের এক সভায় মহাত্মা গান্ধী ও মওলানা মুহম্মদ আলী বক্তৃতা করেন। গান্ধীজি আন্দোলনে পক্ষে ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।[৪৪]

ফেব্রুয়ারি মাসে মির্জাপুর স্কোয়ারে পুনরায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় জনাব আকরাম খান বাংলার সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য ছাত্ররা যাতে তাঁদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে অব্যাহতভাবে বিদ্যালয় বর্জন চালিয়ে যায় তার জন্যও ছাত্রদের উপদেশ দেন।[৪৫]

অসহযোগের এ চরম মুহূর্তে এ. কে. ফজলুল হক ব্রিটিশ পন্য বর্জন এবং সরকার প্রদত্ত উপাধি বর্জনের কর্মসূচীকে সমর্থন দিলেও স্কুল কলেজ বর্জনে শিক্ষার্থীদের চরম ক্ষতি হবে ভেবে স্কুল কলেজ বর্জন কর্মসূচীর সাথে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন এরূপ কর্মসূচীতে মুসলমান ছাত্রদেরই বেশী ক্ষতি হবে।[৪৬] কিন্তু হিন্দু-মুসলমানদের

Dhaka University Institutional Repository

গনআন্দোলনের মুখে জনাব এ. কে. ফজলুল হকের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সফল হয়নি বরং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনের কার্যক্রম অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে।[৪৭] শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক এবং বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাসেম তাঁদের মানসিকতার পরিবর্তন করে আইন পরিষদের নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন।[৪৮] তাদের এ ভূমিকার জন্য "The Musalman" পত্রিকাটি লিখে যে, "Now Moulavi Fazlul Haq has turned his back and is going to stand for election to the Bengal Legislative Council, inspite of the decision to the contrary, arrived at by the Khilafat Committee, people say that the shadow of a ministership had proved too tempting to him and so like a brave general encouraging and leading an army to battle field, he shows his back and runs away to a safe retreat ... leaving his followers to their fate."[৪৯]

ফজলুল হক ও মৌলভী আবুল কাসেম খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাঁদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। কলকাতার মির্জাপুর পার্কের সভায় মওলানা আকরাম খান সরকারী ট্রামওয়ে কোম্পানী বর্জন করার সাথে সাথে আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।[৫০]

এ সময় বাংলার মুসলিম রাজনীতিকগণ ইউরোপীয়দের কারখানার শ্রমিকদের অসহযোগের প্রতি আত্মনিয়োগ করার প্রচেষ্টা চালান। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ভারতে ইউরোপীয়দের পারিবারিক কাজে নিয়োজিত মুসলমান লস্কর ও গৃহভৃত্যদের এবং মওলানা আকরাম খান মুসলমান দপ্তরীদের তাদের কর্মত্যাগ করার জন্য সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৫১] মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে মওলানা ইসলামাবাদী এবং মওলানা আকরাম খান শ্রমিকদের মধ্যে অসহযোগের মর্মবাণী প্রচারের মাধ্যমে তাঁদেরকে আন্দোলনের ছায়াতলে সমবেত হবার জন্য জোড় প্রচেষ্টা চালান।[৫২]

এ সময় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সারা ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত। মাদ্রাসার ছাত্ররাও ঐ আন্দোলনে যোগ দেন। ফলে মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক ছাত্র সরকারী মাদ্রাসা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ সময় মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরের অধিবাসী

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আবুল হুফ্ফাস মুহাম্মদ ফসীহ কলকাতা মাদ্রাসার সরকারী বৃত্তিধারী একজন কৃতি ছাত্র মাদ্রাসা ত্যাগ করে মওলানা আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলকাতার নাখোদা মসজিদের আওতাধীন কওমী মাদ্রাসায় পড়াশুনা আরম্ভ করেন।[৫৩]

বরিশাল জেলার মওলানা নাসির আহমদ কলকাতা মাদ্রাসার একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনিও খিলাফত আন্দোলনে যোগাদান করেন। কলকাতা মাদ্রাসায় হরতাল ডাকার ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনের দায়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।[৫৪]

কলকাতার অধিবাসী প্রখ্যাত আলিম, চিকিৎসক ও রাজনীতিবিদ হাকিম আব্দুর রউফ দানাপুরী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি ৬ মাস কারাবরণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল কলকাতা খিলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন।[৫৫]

403779

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের এ পর্যায়ে ব্রিটিশপণ্য বর্জনের বিষয়টিও গুরুত্ব লাভ করে। কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির আহ্বানে মওলানা আকরাম খান সহ বহু মুসলিম রাজনীতিক ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করে বন্দরের তৈরী সাদা লুঙ্গি, সাদা কুর্তা ও সাদা টুপি ব্যবহার করতে শুরু করেন। স্বদেশী পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য মুসলিম রাজনীতিকরা কলকাতায় "স্বদেশী-খিলাফত স্টোরস লিঃ" নামক একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক ছিলেন, মওলানা মনিরুজ্জামান ও মওলানা আকরাম খান। স্বদেশী পণ্যের প্রসারে এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৫৬]

কলকাতার বড় বাজারে ১৯২১ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিদেশী কাপড় বয়কট এবং বিদেশী কাপড়ের দোকান বন্ধের জন্য পিকেটিং করার ফলে ব্যবসায়ী মহলে তিনসপ্তাহ ব্যাপী অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।[৫৭] ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতার মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স গান্ধীজির সাথে দেখা করে বিদেশী কাপড় আমদানী বন্ধের জন্য যে পিকেটিং হয়েছে, তাতে যে ক্ষতি হয়েছে, তার বর্ণনা করেন। গান্ধীজি তাঁদের বলেন,

> "আপনাদের মধ্যে যাঁরা বিদেশী কাপড়ের ব্যবসা করেন, তাঁদের কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা হলো হিন্দু-মুসলমান আমাদেরকে যেভাবে সাহায্য করেছেন, আপনারাও আমাদের সহায়তা করুন। দেশ থেকে প্রতি বছর ৮০ কোটি টাকা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশে চলে যাচ্ছে। ফলে দিন দিন দেশ অধিকতর দরিদ্র হয়ে পড়ছে। আজ দেশ জেগেছে এবং দেশবাসী বিদেশী দ্রব্য বয়কটে কৃতসংকল্প হয়ে স্বরাজ লাভের চেষ্টা করছে। আমার বিশ্বাস, আপনারা বিদেশী বস্ত্র আমদানী বন্ধ করে এই পথে বাধা সৃষ্টি করবেন না।"[৫৮]

১৯২১ সালের ১৩ নভেম্বর কলকাতা ময়দানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনেক সিপাহী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে সরকারী চাকুরী ত্যাগ ও চরখা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়। এ পরামর্শের প্রেক্ষিতে পরবর্তী সপ্তাহে প্রায় ১০০ জন চাকুরী ত্যাগ করেন।[৫৯]

১৭ নভেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস এর আগমনে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় সারা বাংলাতেও হরতাল পালিত হয়।[৬০] ১৮ নভেম্বর কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ও ইউরোপীয় এসোসিয়েশন ১৭ নভেম্বরের হরতালের প্রতিবাদ করে এবং খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন দমনের জন্য বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের নিকট কড়া পত্র দেন। ১৯ নভেম্বর কলকাতার বেঙ্গল গভর্নমেন্টের নির্দেশে কংগ্রেস, খিলাফত ও জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন সমূহকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং খিলাফত ও কংগ্রেস নেতা কর্মীদের ধড়পাকড়, অভিযোগ আনয়ন এবং তাঁদের কণ্ঠরোধের আদেশ বলবৎ করা হয়। পুলিশ খিলাফত অফিস তল্লাশী করে নথিপত্র নিয়ে যায়। ২০ নভেম্বর পুলিশ কমিশনার কলকাতা শহর ও শহরতলীতে তিন মাসের জন্য সভা-মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কোন কোন মফস্বল এলাকাতেও এ নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। সভা-সমিতি ও মিছিল নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে কংগ্রেস ও খিলাফত কর্মীরা কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে, হ্যালিডে পার্ক ও অন্যান্য স্থানে সভা অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করেন।[৬১]

৬ ডিসেম্বর কাপড়ের দোকানে পিকেটিং এবং খদ্দরের কাপড় বিক্রির দায়ে ৪জন স্বেচ্ছাসেবক সহ সি. আর. দাসের পুত্র মাস্টার চিরঞ্জন দাস একজন ইংরেজ সার্জেন্টের হাতে গ্রেফতার ও প্রহৃত হন।[৬২] ৭ ডিসেম্বর খদ্দর বিক্রির দায়ে সি. আর. দাসের স্ত্রী বাসন্তী দেবী, বোন উর্মিলা দেবী ও মিস সুনীতি দেবী সহ আরো ৫০ জন গ্রেফতার হন। এই প্রথম মহিলা প্রকাশ্য সত্যাগ্রহে অংশ নিলেন। এতে চতুর্দিকে হৈ-চৈ শুরু হয় এবং হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান রাস্তায় নেমে আসেন। ঐ রাতেই বেঙ্গল গভর্নমেন্টের নির্দেশে সি. আর. দাসের পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দেয়া হয়। এর প্রতিবাদে পরদিন কাপড়ের দোকানে পিকেটিং এবং খদ্দর বিক্রি শুরু করে এবং শত শত ছাত্র রাস্তায় নেমে পড়ে।[৬৩]

Dhaka University Institutional Repository

১০ ডিসেম্বর কলকাতায় মি. চিত্তরঞ্জন দাস, মওলানা এ. কে. আজাদ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, পদ্মরাজ জৈন, অম্বিকা প্রসাদ বাজপাই, মওলানা আকরাম খান সহ মোট ১৫০ জন গ্রেফতার হন। সেদিন সামরিক বাহিনী লুইসগান নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল দেয়। ফলে ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি হয় কলকাতার পুলিশ ধরপাকড়, লাঠিচার্জ, খানা তল্লাসীর অভিযান চালায়। অধ্যক্ষ হেরাম্বা মিত্র সেনাবাহিনীর সদস্যের হাতে পাশবিক ভাবে নির্যাতিত হন। এভাবে পুরো ডিসেম্বর মাসে নেতা-কর্মী স্বেচ্ছাসেবক গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন। বাঙলার মফস্বলে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত নারায়নগঞ্জে ৭২ জন, মাদারীপুরে ২০০ জন এবং অন্যান্য স্থানেও স্বেচ্ছাসেবক গ্রেফতার হন। আসাম শীলচরের খিলাফত প্রেসিডেন্ট মৌঃ আব্দুল মুসাবিবর চৌধুরীকে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। কলকাতার সিভিল গার্ড রাস্তায় রাস্তায় প্রহরা আরম্ভ করে।[৬৪]

১৯২১ সালে নির্বাচিত কুমিল্লা জেলা খিলাফত কমিটির সভাপতি ও কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সরকারী আইন অমান্য করার দায়ে দু' সপ্তাহের কারাদণ্ড ভোগ করেন।[৬৫]

কলকাতায় বসবাসকারী নামজাদা আলিম, প্যান-ইসলামী রাজনীতিক ও পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম রূপকার আল্লামা মওলানা রাগিব আহসান ১৯১৮ সাল থেকে ১৫ বছর বয়সে তুরস্ককেন্দ্রীক রাজনীতি শুরু করেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি অন্যান্য নেতাদের সাথে কলকাতাস্থ আলীপুরের সেন্ট্রাল জেলে কারাবরণ করেন। তিনি মওলানা মুহাম্মদ আলী দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৬৬]

বর্ধমানের মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভা এবং কর্মশক্তির বলে তিনি বাঙলার খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের মাঝে পরিগণিত হন।[৬৭] তিনি এবং তাঁর ভাই মওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী দিনাজপুরে বসবাস করতেন। আব্দুল্লাহেল কাফী কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বি. এ. পড়ার সময় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ত্যাগ করেন এবং দিনাজপুর জেলা খিলাফত কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। মওলানা কাফী মওলানা আজাদের নির্দেশে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকায় এসে খিলাফত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেন এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় খিলাফত ও

Dhaka University Institutional Repository

কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করেন।[৬৮]

১৫ ডিসেম্বর, ১৯২১ তারিখে কলকাতার "পয়গাম" পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আব্দুর রাজ্জাককে আন্দোলনের দায়ে দুবছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।[৬৯]

মওলানা আকরাম খানকে গ্রেফতারের পর কলকাতা আলীপুর জেলে তাঁকে আটক রাখা হয়। তিনি "সেবক" পত্রিকায় "অগ্রসর অগ্রসর" শিরোনামে একখানি উত্তেজনামূলক সম্পাদকীয় লেখার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. সুইন হোর ১৭ ডিসেম্বর তাঁকে এক বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।[৭০] এ সময় "সেবক" পত্রিকাটি কিছুকাল বন্ধ থাকে।[৭১]

মওলানা কাফী ঢাকা থেকে ফিরে যাবার পর মওলানা আকরাম খান এবং শায়েখ আহমদ উসমানী গ্রেফতার হলে মওলানা আকরাম খানের সম্পাদিত উর্দু দৈনিক "যামানা" পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে খিলাফত আন্দোলনের অগ্রগতি সাধনে বিশেষ সহায়তা করেন।[৭২] ২০ ডিসেম্বর কলকাতার রাজপথে ৭০০ জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে ৩২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তখন শিশুদেরও গ্রেফতার আরম্ভ করে। তাদেরকে ছেড়েও দেয়া হয়। কিন্তু তারা পুনঃগ্রেফতারের জন্য কান্নাকাটি করতো। কেউ কেউ চুপিসারে জেলহাজতে ঢুকে পড়তো।[৭৩] ২১ ডিসেম্বর ২৫০ জন গ্রেফতার হন এবং বহু ছাত্র স্কুল কলেজ ত্যাগ করে স্বেচ্ছাসেবকে নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। ২২ ডিসেম্বর একদল মুসলিম প্রতিনিধি কলকাতায় ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে খিলাফত সম্পর্কে তাঁদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। ২৩ ডিসেম্বর ২০০০ জন স্বেচ্ছাসেবক রাস্তায় নেমে আসেন। ৫০০ জন গ্রেফতার হন। ১৮০০০ মিলকর্মচারী ধর্মঘট করেন।[৭৪] ২৪ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স-এর আগমনে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। কলকাতা পৌরসভার কর্মচারীদের হরতালে শহর আংশিকভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।[৭৫] ২৫ ডিসেম্বর মদ্যপায়ী ইউরোপিয়ান সিভিল গার্ডদের দাঙ্গায় ১ জন নিহত ও ২৩ জন আহত হয়। ২৬ ডিসেম্বর কলকাতা মাছুয়াবাজারে পুলিশ তল্লাশী করে এবং মসজিদ ধ্বংস করে অপবিত্র করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।[৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের এরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস আন্দোলনের পক্ষে সহযোগিতার কারণে একটি ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠকরূপে আবির্ভূত হয় এবং খিলাফত কমিটি জনগণকে সংগঠিত করার জন্য অধিক মনোযোগী হওয়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অস্তিত্ব এক পর্যায়ে ম্লান হয়ে যায়।[৭৭] এসময় হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। ফলে অনেক মুসলিম রাজনীতিক মুসলিম লীগের রাজনীতিকে নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করেন।[৭৮] তাই মুসলিম লীগের রাজনীতি ১৯২১ সাল হতে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে।[৭৯] অনেক জেলায় কংগ্রেস অফিসেই খিলাফত কমিটির কার্যক্রম চলে।[৮০]

১৯২২ সালের ২ জানুয়ারি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের অজুহাতে শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। ফলে কয়েকটি কারখানা বন্ধ থাকে। ৩ জানুয়ারি ৮০ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেফতার করা হয়। ৯ জানুয়ারি মহিলারা পিকেটিং এর জন্য রাজপথে নামলে অম্বিকা প্রসাদ বাজপাইকে ১ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৮১] ১৫ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার জন্য কলকাতার বহুস্থানে সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৮২] ১৯ জানুয়ারি মিসেস দাসের উদ্যোগে সভা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশের বাধার মুখে সভা পণ্ড হয়ে যায়। হেমনলিনী দেবী নামে এক বাঙালী শ্রোতা ব্রিটিশ কর্মকর্তার আদেশে প্রহৃত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন এবং বাবু এস. চক্রবর্তীকে স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকাভূক্তির দায়ে ১ বছরের করাদণ্ড দেয়া হয়। ২২ জানুয়ারি কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিশাল সভা হয় কিন্তু পুলিশের বাধায় তা পণ্ড হয়। সেখানে ২৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়।[৮৩] ২৬ জানুয়ারি কলকাতায় বেশ কয়েকটি বড় বড় সভা থেকে ৫০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেফতার করা হয়।[৮৪]

১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি চৌরিচৌরার ঘটনার প্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী তুঙ্গে উঠা অসহযোগ আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেন। তাঁর আকস্মিক ঘোষণায় মুসলমানরা অত্যন্ত নিরাশ হন।[৮৫]

কিন্তু খিলাফত প্রশ্নটি রয়েই গেল। তাই খিলাফত আন্দোলন অব্যাহত থাকে।[৮৬] ১২ ফেব্রুয়ারি প্রায় দুই হাজার কংগ্রেস ও খিলাফত ভলান্টিয়ার মিছিল বের করে চিৎপুর, হ্যারিসন

Dhaka University Institutional Repository

রোড, সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ প্রভৃতি বড় বড় রাস্তা দিয়ে পরিভ্রমণ করেন। এতে ৫০০ জন গ্রেফতার হন। সেদিন চিত্তরঞ্জন দাস ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কে ৬ মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়।[৮৭]

২৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভায় কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বারদৌলির সিদ্ধান্ত অনুসারে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কোন প্রদেশেরই সব ডেলিগেটর সর্বসম্মতিক্রমে তা সমর্থন করেনি। বাঙলা প্রদেশের ডেলিগেটরা প্রস্তাব করলেন যে, প্রাদেশিক কংগ্রেসগুলোকে আত্মরক্ষামূলক আইনভঙ্গের নীতি প্রয়োগের অধিকার দেয়া হোক। অবশ্য কংগ্রেস কমিটিকে এ নীতি প্রয়োগের পূর্বে দেখতে হবে যে, আন্দোলনটি নিরূপদ্রব থাকতে পারবে কি-না? তাঁরা আরো প্রস্তাব করেন যে, খদ্দর পরিধান ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ এ দুটি শর্ত তুলে দেয়া হোক। কিন্তু বাঙলার এ প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। মোট কথা, কংগ্রেস কমিটিতে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারির বারদৌলির প্রস্তাবটি সামান্য পরিবর্তন সহ গৃহীত হয়।[৮৮]

বাংলার কংগ্রেস কমিটিও বারদৌলির সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং তাঁরা বাংলায় আপাতত সভা-সমিতি, মিছিল ও পিকেটিং বন্ধ রাখাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন।[৮৯] কিন্তু তখন পর্যন্তও উলামাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাঁরা বারদৌলির সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষিপ্ত হলেন।[৯০] কারণ নেতৃস্থানীয় মৌলভী মওলানা ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন জেলার শত শত আলিম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে কোন না কোন ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাংলার প্রায় সকল আলিমই খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।[৯১]

খিলাফত আন্দোলনের দায়ে বাংলা-আসামের কয়েকশ' আলিম কারাভোগ করেন। ১৯২৩ সালের অক্টোবরে "ছোলতান" পত্রিকায় "দেশের কথা" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়,

> "খেলাফত ও স্বরাজ আন্দোলনে বাংগালা ও আসাম প্রদেশে অন্ততঃ ১০০ আলিম কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন; উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজি নবীশদের মধ্যে ৩/৪ জনের বেশী নহে। যাঁহারা ওকালতি ও চাকুরী ছাড়িয়াছিলেন, তাঁহারা আবার নাকে খৎ দিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারই নাম কি জাতীয় সহানুভূতি ও দেশাত্মবোধ? ... উত্তর বঙ্গের ৭ টি জেলায় শতাধিক উচ্চ শিক্ষিত মোছলমান ওকিলের মধ্যে একজন মাত্র মাতিয়াছিলেন। আবার তিনি বৎসরাধিকাল হইতে ঘরে

Dhaka University Institutional Repository

ফিরিয়া আসিয়াছেন। ... আলেমগণের মধ্যে একমাত্র রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় ৫০ জন লোকের নাম করিতে পারা যায়, যাঁহারা ধর্মের নামে, দেশের মুক্তির নামে ত্যাগের পরিচয় দিতে এবং লাঞ্ছনা ভোগ করিতে এবং অনেক কারাক্লেশ ভোগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পূর্ববঙ্গ, বিশেষত চট্টগ্রাম বিভাগ ও শ্রীহট্ট জেলার ত কথাই নাই। সেখানে শতাধিক আলেম দেশ ও সমাজের জন্য কারাক্লেশ ভোগ করিয়াছেন এবং এখনও কয়েকজন কারাগারে আছেন। .... আমি বলিব, জাতীয়তা, ধর্মানুরাগ, জাতীয় সহানুভূতি ও দেশাত্মবোধ জ্ঞান যদি বর্তমানে কোন দল থাকে, তবে তাহা সেই পুরাতন ধরনের লোকের মধ্যেই আছে।"[৯২]

১৯২৪ সালের ৩ মার্চ তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা মুস্তফা কামাল আইন প্রণয়ন করে মুসলমানদের এ প্রাচীন ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান খিলাফতের বিলোপ সাধন করলে[৯৩] ভারতের তথা বাংলার মুসলমানগণ বিস্মিত হন। মুস্তফা কামালকে প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। কিন্তু মুস্তফা কামাল ভারতের মুসলমান নেতাদের এ অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। ফলে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ে।[৯৪]

তথ্যসূত্র

১. প্রনব কুমার চট্টপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪

২. আবু আল সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮

৩. Pradip Kumar Lahiri, *Bengal Muslim Thought (1818-1947)*; Its Liberal and Rational trends, Calcutta, 1991, p. 89

৪. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৬

৫. সিরাজুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩১

৬. Mushirul Hasan, *Nationalism and Communal Politics in India (1916-1928)*, New Delhi, 1979, p. 161

৭. Mitra, N. N. (ed), *Indian Annual Register 1921, Part*, I, p. 38 (পরবর্তীতে *Register* হিসেবে উল্লেখিত)

৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ঢাকা, ১৪ মার্চ, ১৯২০

৯. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 307

Dhaka University Institutional Repository

১০. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন, ১৯৭০ ইং, পৃ. ৩১। ইব্রাহীম সাহেব পর্যায়ক্রমে জজ, জাস্টিস, ভাইস চ্যান্সেলর ও মন্ত্রী ছিলেন। সূত্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১২. আবু জাফর (সংকলিত ও সম্পাদিত), *মওলানা আকরাম খাঁন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৮৩

১৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ মার্চ, ১৯২০

১৪. *Register 1921, Part I, op. cit.*, p. 40, *ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ মার্চ, ১৯২০, Mushirul Hasan, *op. cit.*, pp. 161-162

১৫. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, কলকাতা, ৫ এপ্রিল, ১৯২০

১৬. *Register 1921, Part I, op. cit.*, pp. 45-47

১৭. Chandiprasad Sarkar, *The Bengal Muslims: A Study in Their Politicization (1972-1922)*, Calcutta, 1991, p. 96

১৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ আগস্ট, ১৯২০

১৯. *Register 1921, Part I*, p. 47

২০. *Ibid*, part III, p. 107

২১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬, মি. জিন্নাহ-এর অসহযোগ এবং গান্ধীজির কর্মসূচী হয়তবা এক নাও হতে পারে। কারণ মি. জিন্নাহ গান্ধীজির অসহযোগ কর্মসূচীকে সর্বদায় বিরোধিতা করেছেন। সূত্রঃ Francis Robinson, *op. cit.*, p. 320.

২২. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

২৩. Chandiprasad Sarkar, *op. cit.*, pp. 104-105

২৪. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০-১০১

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

২৬. Chandiprasad Sarkar, *op. cit.*, p. 106

২৭. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

২৮. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (১৭৫৭-১৯৪৭), ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.১৪৬

২৯. Chandiprasad Sarkar, *op. cit.*, p. 113

Dhaka University Institutional Repository

৩০. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২

৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

৩২. *Register 1921, Part I*. p. 49

৩৩. মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, *যুগবিচিত্রা*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৭, ১৯৯৭, পৃ. ১০৬-১০৮

৩৪. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২-১০৩, ১৯১১ সনে ত্রিপলীর যুদ্ধ, ১৯১২ সনে বলকান যুদ্ধ, কানপুর মসজিদে হাঙ্গামা (১৯১৩), খ্রীষ্টান মিশনারীদের খ্রিষ্টধর্ম প্রচার, ইসলামের উপর তাঁদের কলংক লেপন ইত্যাদির কারণে সারা ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলার আলেম সমাজও রাজনীতিতে সচেতন হয়ে স্বজাতির রাজনৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধনের মধ্যদিয়ে ইসলাম রক্ষার প্রয়োজনে বর্ধমানের মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী (পরবর্তীতে দিনাজপুর বসবাস করতেন), মওলানা আকরাম খান, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সহ অনেকে ১৯১৩ সালের ১৫-১৭ মার্চ বগুড়া জেলার বানিয়াপাড়া গ্রামে "আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙালা" প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন আব্দুল্লাহেল বাকী, সহ-সভাপতি ছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ, জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন মওলানা আকরাম খান, যিনি এর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। যুগ্ম-সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও ডঃ শহীদুল্লাহ্। সূত্রঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৫

৩৫. আবুল মনসুর আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬

৩৬. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬-৭৭

৩৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ জানুয়ারি, ১৯২১

৩৮. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৮

৩৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ জানুয়ারি, ১৯২১

৪০. *Register 1922*, p. 11

৪১. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ জানুয়ারি, ১৯২১

৪২. *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

৪৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ জানুয়ারি, ১৯২১

৪৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

৪৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪-৮৫

৪৭. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩

৪৮. Chandiprasad Sarkar, *op. cit.*, p. 110

৪৯. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০০

৫০. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

৫১. Chandiprasad Sarkar, *op. cit.*, p. 103

৫২. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫

৫৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮২-৮৩, মওলানা আবুল হুফফায মুহাম্মদ ফসীহ ১৯২৭ সালে কলকাতা মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন এবং প্রভাষক পদে উন্নীত হন। ১৯৩৭ সালে তাঁকে প্রফেসর পদে উন্নীত করে চট্টগ্রাম মাদ্রাসায় বদলী করা হয়। ১৯৪২ সালে তিনি পুনরায় কলকাতা মাদ্রাসার এডিশনাল মৌলভী পদে যোগদান করেন। পরের বছর তাঁকে ভাইস প্রিন্সিপাল পদে হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বদলী করা হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে তিনি ঢাকা ইসলামীক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে প্রফেসর পদে যোগদান করে ১৯৫৮ সালে ১৪ অক্টোবর অবসর গ্রহণ করেন। সূত্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

৫৪. যুগবিচিত্রা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৫, মওলানা নাসীর আহমদ পরবর্তীতে কলকাতা মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। সূত্রঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩

৫৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪

৫৬. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫

৫৭. *Register 1922*, p. 42

৫৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯২১

৫৯. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮২-৮৩

৬০. *Register 1922*, p. 53

৬১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩

৬২. *Register 1922*, p. 58

৬৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪

৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪-৮৫

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫-১০৬

৬৬. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪-৮৫

৬৭. শামছুন নাহার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪

৬৮. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭

৬৯. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫

৭০. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬, শামছুননাহার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯

৭১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬

৭২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৮, মাওলানা কাফী ঢাকা থেকে কলকাতা ফিরে যাবার পর "যামানা" পত্রিকার প্রথম সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। শায়েক আহমদ উসমানী ছিলেন এর অন্যতম সম্পাদক। তিনি ছিলেন উর্দুভাষী। সূত্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৭৩. *Register 1922*, p. 65

৭৪. *Ibid*, p. 66

৭৫. *Ibid*, pp. 66-77

৭৬. *Ibid*, p. 67

৭৭. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bangal Muslim League and Muslim Politics (1936-1947)*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987, p. 26

৭৮. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮

৭৯. Harun-or-Rashid, *op. cit.*, p. 27

৮০. আবুল মনসুর আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১

৮১. *Register 1922*, p. 69

৮২. *Ibid*, p. 70

৮৩. *Ibid*, p. 71

৮৪. *Ibid*, p. 72

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. Francis Robinson, *op. cit.*, p. 333. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮, Ram Gopal, *Indian Muslims: A Political History (1858-1947)*, Bombay, 1959, Reprinted, 1964, p. 150, মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০

৮৬. Francis Robinson, *op. cit.* p. 333

৮৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২

৮৮. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

৯০. Francis Robinson, *op. cit.*,, p. 334

৯১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫-৮৬, সিলেট জেলা ছিল তখন আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। যার নাম ছিল শ্রীহট্ট। ১৯৪৭ সালের গণভোটে তা পূর্ব বাংলার অংগে পরিণত হয়। সূত্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

৯৩. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

৯৪. Moinul Haq, *S. Mohamed Ali, Karachi, Pakistan Historical Society, 1978*, pp. 138-139

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রতিক্রিয়া

কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি গঠনের ৬ মাস পর ঢাকায় খিলাফত আন্দোলনের তৎপরতা শুরু হয়। ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের খিলাফত আন্দোলনের প্রাণবিন্দু ছিলেন নওয়াব হাবিবুল্লাহ।[১] এছাড়াও মওলানা মুফতী দীন মোহাম্মদ খান তাঁর যৌবন বয়সে খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে অন্যান্য খিলাফত নেতাদের সাথে কারাবরণ করেন।[২]

১৯১৯ সালের ১৭ অক্টোবর ঢাকায় হরতাল সহ খিলাফত দিবস পালিত হয়। ঐদিন মুসলমানরা তুরস্ক খিলাফতের জন্য নামাজ, রোজা ও দোয়া করেন। হিন্দুরাও অনশন-ব্রত পালন করে মুসলমানদের সাথে একাত্ম প্রকাশ করেন। ঐ দিন বিকেল ৪ টায় তুরস্ক খিলাফত ও খলিফার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে পুরানা পল্টন ময়দানে ২০ হাজার মুসলমান ও বোরকা পরিহিতা কিছু মুসলমান মহিলা উপস্থিত হন। ঢাকা লক্ষীবাজার মিয়া সাহেবের ময়দানের দরগার শাহ আব্দুল্লাহর ইমামতীতে নফল নামাজ আদায় শেষে বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক হিন্দু নেতাও ঐ সভায় যোগদান করেন। নওয়াব পরিবারের খাজা আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন মাস্টার হেদায়েত বখ্শ এবং ডাক্তার রাজকুমার চক্রবর্তী যাঁর বক্তৃতায় অনেকের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। ঐ সভায় ২১ সেপ্টেম্বরের লক্ষ্ণৌর সর্বভারতীয় মুসলিম অধিবেশনের প্রথম চারটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সভায় উপস্থিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মুহম্মদ ইসমাইল খাঁ চৌধুরী (বরিশাল), ঢাকার খান বাহাদুর মৌলভী যহির উদ্দিন আহমদ মির্জা, মুহাম্মদ জাফর সিরাজী, ঢাকার নওয়াব খাজা করীমুল্লাহ, খাজা মুহম্মদ মুসা, হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক, বরিশালের জমিদার আবি আশান, নয়াবাড়ির জমিদার মৌলভী আবদুল হামিদ, ঢাকা পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ও ঢাকা পিপল্‌স এসোসিয়েশনের সম্পাদক ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়, ডাক্তার রাজকুমার চক্রবর্তী, উকিল বাবু হরমোহন শীল সহ অনেকে।[৩]

১৯ ডিসেম্বর ঢাকার করনেশন পার্কে খাজা আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবসমূহ হল:-

Dhaka University Institutional Repository

১. ঢাকায় স্থায়ী খিলাফত কমিটি গঠন,

২. ২৮ ডিসেম্বর অমৃতস্বরের সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির অধিবেশনে ঢাকার প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অর্থসংগ্রহ,

৩. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় মুসলিম লীগে খিলাফত সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন,

৪. মওলানা মুহাম্মদ আলী ও শওকত আলীসহ রাজবন্দী ও অন্তরীণদের মুক্তির জন্য সরকারের নিকট আবেদন।

২০ ডিসেম্বর নওয়াব হাবিবুল্লাহর উদ্যোগে আহসান মঞ্জিলে ঢাকা খিলাফত এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে নওয়াব হাবিবুল্লাহকে সভাপতি, সৈয়দ আবদুল হাফেজকে সহ-সভাপতি, চৌধুরী গোলাম কুদ্দুসকে সম্পাদক, মৌলভী আমিরুদ্দিনকে সহ-সম্পাদক ও মৌলভী আলা বখ্শকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে স্থায়ীভাবে "ঢাকা খিলাফত কমিটি" গঠিন করা হয় এবং অমৃতসরের অধিবেশনে যোগদানের জন্য ৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। ৬ জন প্রতিনিধিরা ছিলেন, মৌলভী আমিরুদ্দিন আহমদ, মৌলভী গোলাম কুদ্দুস, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার রাজকুমার চক্রবর্তী।[৪]

১৯২০ সালের ২০ জানুয়ারি খাজা আবদুশ শাকুর ১ মাস খিলাফত আন্দোলনের দায়ে কারাবরণ করার পর মুক্তিলাভ করেন, যিনি রমনা পোস্ট অফিসের সম্মুখে পিকেটিং করার দায়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন।[৫]

২৩ জানুয়ারি বংশাল পাড়ায় খিলাফতের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য খিলাফতের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় খাজা আব্দুল করিম গ্রেফতার হন।[৬]

২৫-৩০ জানুয়ারি ঢাকার চক বাজারে এবং হাতির ঘাট নামক স্থানে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা খিলাফত কমিটির সহ-সভাপতি খাজা আব্দুল হাফিজ। বক্তাগণ উভয় সভায় খিলাফত নিয়ে আলোচনা করেন।[৭] স্থানীয় খিলাফত কমিটির উদ্যোগে ১৭ ফেব্রুয়ারি নওয়াব পরিবারের খাজা আজিজুল্লাহ এর সভাপতিত্বে দয়াগঞ্জ পাড়ায় এবং ২০ ফেব্রুয়ারি খাজা আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে গেন্ডারিয়া পাড়ায় খিলাফত সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার জন্য খিলাফত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভায় বক্তৃতা করেন শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এল., চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস, ডাক্তার রাজকুমার চক্রবর্তী ও খাজা আব্দুল করিম।[৮] ২২ ফেব্রুয়ারি মিরপুরে ঢাকা খিলাফত কমিটির সভাপতি নওয়াব হাবীবুল্লাহর সভাপতিত্বে খিলাফত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা করেন চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু সুরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত ও রাজকুমার চক্রবর্তী। ২৭ ফেব্রুয়ারি সৈয়দ আবদুল হাফিজের সভাপতিত্বে সন্ধ্যায় করনেশন পার্কে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরবর্তী ২ মার্চে সদ্য কারা মুক্ত যে সব পাঞ্জাবি নেতার ঢাকায় আগমনের কথা ছিল, তাঁদের প্রতি সংবর্ধনা দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেন শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত, খাজা আব্দুল করিম ও রাজকুমার চক্রবর্তী। আগমনকারীদের অভ্যর্থনার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়।[৯]

১৯২০ সালের ২ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় "ঢাকা জেলা সমিতি" এর পক্ষ থেকে স্থানীয় করনেশন পার্কে নওয়াব হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ঢাকায় মওলানা শওকত আলী ও আবুল কালাম আজাদের শুভাগমন উপলক্ষে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা শওকত আলী উর্দু ভাষায় দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন, তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষা না হলে মুসলমান ধর্ম রক্ষা পাবেনা। সভাপতির ভাষণে হাবিবুল্লাহ বলেন:

> "ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যদি সৌহার্দ্য-সদ্ভাব থাকে, তবে এক জাতির বিপদের সময় তারা প্রতিবেশী জাতির সহানুভূতি ও সাহায্য পেয়ে বিপদোত্তীর্ণ হতে পারে। মুসলমানদের জগতের একক ও অদ্বিতীয় নেতা ও খলিফা রোমের সুলতানকে ইউরোপের দিক থেকে সরিয়ে দেওয়ার অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলছে। আরব দেশের পবিত্র স্থানসমূহ আমাদের খলিফার শাসনাধীন থাকবে না– এটা হতে পারে না। আল্লাহর নিকট খলিফার মঙ্গল কামনা করা এবং যে কোন উপায়ে তাঁর সাহায্য করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য।"[১০]

৩ মার্চ আহসান মঞ্জিলে নওয়াব হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে খিলাফতের বিষয় আলোচনার জন্য এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশ বরেন্য খিলাফত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা আজাদ সুবহানী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা আকরাম খাঁ, মৌলভী মুজিবর রহমান বক্তৃতা করেন।[১১] সভাপতির ভাষণে হাবিবুল্লাহ বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"ভারত-সচিব মন্টেগো যথার্থই বলেছেন, "খলিফার উপর কারো হস্তক্ষেপ হলে ভারতের মুসলমানদের রাজভক্তি বিচলিত হবেই এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির প্রতি তাঁদের আস্থা ক্ষুন্ন হবেই।" আমাদের খলিফা ও পবিত্রস্থানগুলোর ব্যাপারে প্রতিকূল সিদ্ধান্ত হলে মুসলমানদের পক্ষে আল্লাহর আদেশ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।"

তিনি আরও বলেন,

"যে অপঘাতক সংকটে পড়ে মুসলমান সমাজ আজ মুহ্যমান হয়ে পড়েছে, সেই সংকটকালে হিন্দু ভাইদের অকপট সহানুভূতি ও আন্তরিক সহযোগিতা পেলে আমরা আমাদের ন্যায্য দাবী অধিকতর দৃঢ়ভাবে জগতের সম্মুখে উপস্থিত করতে পারবো।" তিনি বলেন, "আপনারা সকলেই জানেন, আমি সামান্য সিপাহীরূপে 'বাঙালি পল্টনে' ভর্তি হই। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছিল ঘোর দুর্দশা। সেই দুর্দিনে আমার স্বধর্মী আরো অনেকে আমার অনুসরণে 'বাঙালি পল্টনে' যোগ দিয়েছিলেন। সেই দুর্দিনে কি ভারত, কি বিলাত– সর্বত্রই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বারবার অঙ্গীকার করেছিলেন যে, যুদ্ধের ফল যা-ই হোক না কেন, তুরস্ক অবিচ্ছিন্ন থাকবেই। ইসলামের পবিত্রস্থানসমূহ কখনো আক্রান্ত হবেনা। কোন্ ব্যক্তি খলিফা থাকবেন, তা মুসলমানরাই স্থির করবেন। এই পূর্বাপর প্রতিশ্রুতি পেয়েই আমি 'বাঙালি পল্টনে' যাই। যদি পূর্বাপর প্রতিশ্রুতি এখন রক্ষিত না হয়, তবে মুসলমানগণ তাঁদের আল্লাহর আদেশ অনুসারেই খিলাফত সমস্যার সমাধান করতে বাধ্য হবেন।"[১২]

সভাপতি সাহেবের বক্তৃতা শেষ হলে ঘন ঘন 'বন্দেমাতরম" ও "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি হতে থাকে। তাঁর বক্তৃতার পর আবুল কালাম আজাদ উর্দু ভাষায় খিলাফতের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেন। মওলানা শওকত আলী হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য গো-কোরবানীর পরিবর্তে অন্য কিছু কোরবানীর উপদেশ দেন।[১৩]

বক্তব্য শেষে ঐ সভা কলকাতা টাউন হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির গৃহীত প্রস্তাবলী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

তারপর খাজা আব্দুল করিম প্রস্তাব করেন যে, বিলাতে সফররত খিলাফত প্রতিনিধি দলের নেতা মওলানা মুহাম্মদ আলী এবং তাঁর সঙ্গীদের নিকট এ মর্মে তার করা হোক যে, হিন্দু-মুসলমান খিলাফত প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। সুতরাং তাঁরা যেন ভারতের খিলাফত কমিটির নির্দেশানাযায়ী খিলাফতের দাবী উপস্থাপন করতে পশ্চাৎপদ না হন।[১৫]

১৫ মার্চ পটুয়াটুলীর রাস্তায় ঢাকা খিলাফত কমিটির উদ্যোগে ১২ জন লোক শোক প্রকাশক শুভ্র বর্ণের পরিচ্ছেদে নিজেদের আপাদমস্তক আবৃত করে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে শোকসূচক সংগীত পরিবেশন করেন এবং খিলাফত তহবিলের জন্য সকলের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেন। ১৬ এবং ১৭ মার্চ তারিখেও শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সাহায্য প্রার্থনা করেন।[১৬]

১৮ মার্চ বিপিনচন্দ্র পাল ও মৌলভী ইসমাইল হোসেন সিরাজীর ঢাকা আগমন উপলক্ষে বিকেল ৫ টার সময় করনেশন পার্কে শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ১০ হাজার হিন্দু-মুসলমানদের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিপিনচন্দ্র পাল খিলাফত রক্ষার জন্য হিন্দু-মুসলমানদের কিভাবে কাজ করা উচিৎ, সে বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন, খিলাফত বিষয়টি সম্পূর্ণ ধর্মমূলক। তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা লোপ পেলে খিলাফত রক্ষা হবেনা। এতে মুসলমানদের ধর্ম নষ্ট হবে। তিনি আরও বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অসংখ্য মুসলমান প্রজা বাস করেন। শুধু ভারতেই মুসলমানদের সংখ্যা ৭ কোটিরও বেশী। সুতরাং এ সকল প্রজার দিকে চেয়ে ব্রিটিশরাজের খিলাফত রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য।

১৯ মার্চ শুক্রবার সারা ভারতের ন্যায় ঢাকা শহরেও পূর্ণ হরতাল সহকারে দ্বিতীয় খিলাফত দিবস পালিত হয়। সেদিন রাস্তায় কোন যানবাহন দেখা যায়নি। সকল শ্রমিকরা তাঁদের কাজ বন্ধ রাখেন। স্থানীয় ইডেন হাইস্কুলটিও বন্ধ ছিল। সকলেই আনন্দচিত্তে হরতাল পালন করেন। মুসলমানরা রোজা পালন করেন। অনেক হিন্দুও সারাদিন উপবাসী ছিলেন। মসজিদে মসজিদে খিলাফত বজায় রাখার জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

বিকেল ৪টায় করনেশন পার্কে বিরাট জনসভা হয়। যা ৪০ বছরের মধ্যেও এতবড় সমাবেশ হয়নি। অনেকে পার্কে জায়গা না পেয়ে গাছের উপর এবং বাড়ীর প্রাচীরের উপর

Dhaka University Institutional Repository

বসেছিলেন। শ্রোতারা নীরবে বক্তৃতা শোনেন। মাঝে মাঝে "বন্দেমাতরম" ও "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি শোনা যায়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ আব্দুল হাফিজ। তাঁর আদেশে খাজা আব্দুল করিম একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন যে,

"That the people of Dacca in a public meeting respectfully pray his Excellency to convey to his Majesty, the King Emperor that if peace terms with his Majesty the Khalifatul Muslimeen, the Sultan of Turkey be contrary to the dictates of shariat and commendants of Islam, it will put the several possible strain on the loyalty of the Musalmans of India."

উকিল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ঐ প্রস্তাব সমর্থিত হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তারপর ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং বিপিনচন্দ্র পাল সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় মুলতবীর পর পুনরায় সভা শুরু হয়ে রাত ৯টা পর্যন্ত সভা চলে।[১৭]

ঐ দিন ঘোড়াশালে মুনশী আবু নাসের সারীদুল্লাহর সভাপতিত্বে তিন হাজার লোকের সমাবেশে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘোড়াশালের অনেক মুসলমান রোজা সহ মসজিদে-মসজিদে খিলাফতের জন্য প্রার্থনা করেন। তুরস্কের সকল দেশ সুলতানের অধিকারে রাখার জন্য এবং খিলাফতের সম্মান রক্ষার জন্য ভাইসরয়ের নিকট টেলিগ্রাফ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৮]

৯ এপ্রিল সৈয়দ আব্দুল হাফিজের সভাপতিত্বে করনেশন পার্কে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, খিলাফত প্রশ্নের সমাধান মুসলমানদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দেয়া প্রতিশ্রুতির অনুরূপ হবে। তা না হলে সরকারকে সাহায্য করা হিন্দু-মুসলমানদের পক্ষে অসম্ভব হবে।[১৯]

২ জুলাই খিলাফত কমিটির উদ্যোগে সৈয়দ আব্দুল হাফিজের সভাপতিত্বে ঢাকার করনেশন পার্কে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, "তুরস্ক-সন্ধির পরিবর্তন না করা হলে মুসলমানগণ সরকারের সাথে সহযোগিতা করবেনা।"[২০]

১ আগস্ট সারা ভারতের ন্যায় ঢাকায় হরতাল সহকারে তৃতীয় খিলাফত দিবস পালিত হয়। স্থানীয় খিলাফত কমিটির উদ্যোগে বিকেলে করনেশন পার্কে খাজা আব্দুল করিমের

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতিত্বে প্রায় ৬ হাজার লোকের সমাগমে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।[২১] সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে,

"কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির আন্দোলনের সাথে এই নগরবাসীদের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত তুরস্ক-সন্ধি শর্তের আবশ্যকীয় পরিবর্তন না করা হয়, ততদিন যতদূর সম্ভব স্বদেশজাত দ্রব্য গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং সরকার প্রদত্ত উপাধি বর্জন ও অবৈতনিক সরকারী কার্য হতে ইস্তফা দেয়ার জন্য এই সভা দেশবাসীকে অনুরোধ করছে।" ঐ দিন নওয়াব পরিবারের খাজা আব্দুল করিম তুরস্কের সন্ধিশর্ত তুরস্কের অনুকূলে না হওয়ায় তিনি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ত্যাগ করেন।[২২] ৬ অক্টোবর ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে এক বিশাল ছাত্রসমাবেশে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আকরাম খাঁ ছাত্রদের হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য স্থাপনের জন্য গুরুত্বারোপ করে বক্তৃতা দেন।[২৩]

পরবর্তীতে মৌলভী ইব্রাহীম সাহেব সক্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ করে ছাত্রদের ছোট-খাট একাধিক মিটিং-এ বক্তৃতা দেন। হোস্টেল আঙ্গিনায় বক্তৃতা নিষিদ্ধ হলে তিনি হোস্টেলের বাইরে বক্তৃতা শুরু করেন। বর্তমানে যেখানে টিবি ক্লিনিক, এখানে একটি মাটির টিপিতে দাঁড়িয়ে তিনি কয়েকদিন বক্তৃতা করেন। তখন আবুল কালাম শামছুদ্দিন কলকাতা কারমাইকেল হোস্টেল থেকে প্রতি সপ্তাহে দীর্ঘ পত্র লিখতেন।[২৪]

ঢাকার খিলাফত কমিটির অফিস হুসাইনী দালানে অবস্থিত ছিল। ২৭ নভেম্বর পুলিশ তল্লাশী চালিয়ে কাগজ-পত্র নিয়ে যায়।[২৫] ৮ ডিসেম্বর খাজা আব্দুল হাফিজের নেতৃত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকার একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১২ ডিসেম্বর ঢাকায় একই দিনে সহযোগিতা বর্জন ও সহযোগিতা বর্জন প্রত্যাখানের দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সহযোগিতা বর্জন প্রত্যাখানের সভাটি হয় নওয়াব হাবিবুল্লাহ ও এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে। সভাটি হয় অপরাহ্নে ঢাকার নর্থব্রুক হলে। সেখানে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিলনা। ২০০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।[২৬] সভায় শেষ পর্যায়ে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, "সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে এই অধিবেশনে সমবেত প্রতিনিধি ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন যে, ইংল্যান্ড ও তার মিত্র শক্তিবর্গ খিলাফত প্রশ্ন সংক্রান্ত (সেভরে) সন্ধি

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তি দ্বারা মুসলমান ধর্মের যে অবমাননা করেছেন, তার প্রতিকারের জন্য যে সব বৈধ উপায় অবলম্বন করা হবে, এ সম্মিলন তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে বিদ্যার্থীদের বহিস্করণের জন্য যে আন্দোলন চলছে, সম্মিলন তার তীব্র প্রতিবাদ করছে।"

অসহযোগের পক্ষে সভাটি অর্থাৎ ছাত্রদের স্কুল বর্জনের পক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয় করনেশন পার্কে। সভায় চিত্তরঞ্জন দাস বক্তৃতায় বলেন, "ছাত্রদের শিক্ষার জন্য জাতীয় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হলেও এ পর্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণ ছাত্র ঐসব বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য উপস্থিত হচ্ছেনা।"[২৭]

১৯২১ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা জেলার ধামরাই বাজারে ঢাকা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে সহযোগিতা বর্জনের আন্দোলনকে আরো বেগবান করার জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।[২৮]

১৯২১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর নারায়নগঞ্জে খাজা করিমের সভাপতিত্বে অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বসন্তকুমার মজুমদার, পি. সি. ঘোষ এবং সি. আর. দাস বক্তৃতা করেন।[২৯]

১৯ নভেম্বর অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন দমনের জন্য গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিল একটি আদেশ প্রচার করেন যে,

"যেহেতু গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিল মনে করেন যে, বেঙ্গল নন-কোঅপারেশন ভ্যালানটিয়ার কোর, সেন্ট্রাল মোহামেডান ভলানটিয়ার কোর, কংগ্রেস কমিটি কোর এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য অনুরূপ আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করছে, সেহেতু গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিল ১৯২০ সালের সংশোধনী আইন অনুসারে সংশোধিত ১৯০৮ সালের মূল ফৌজদারী আইনের আওতায় ঘোষণা করছেন যে, উক্ত সংগঠনগুলো বে-আইনী।" উক্ত ঘোষণার পর সরকার ধর-পাকড় ও জেল জুলুম শুরু করে। অনেক নেতা খিলাফত অসহযোগের জন্য গ্রেফতার হন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কারাবরণও করেন। ঢাকা খিলাফত কমিটির সেক্রেটারি খাজা আব্দুল করিম ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ ছিল বলে মুচলিকা দেওয়ার পর তাঁকে কারামুক্ত করা হয়। ঢাকা খিলাফত কমিটির অন্যতম সেক্রেটারি ও স্থানীয় জমিদার

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী গোলাম কুদ্দুসও অসহযোগ আন্দোলন করার দায়ে কারাবরণ করেন। ১৯২২ সালের জানুয়ারির দিকে তাঁদের বিচার শুরু হয়।

২৩ নভেম্বর পুলিশ ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ খিলাফত কমিটির অফিস তল্লাশী করে যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে যায়। ২৫ নভেম্বর ঢাকা খিলাফত ও কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে "দেশের বর্তমান সমস্যা ও কর্তব্য নির্ধারণ" এর জন্য সভা করার প্রচারপত্র বিতরণ করলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নেতৃবর্গের উপর ১৪৪ ধারা জারি করে সভা বন্ধ করে দেন। এছাড়াও করনেশন পার্কের গেটে ৭ জন পুলিশকে প্রহরার জন্য মোতায়েন করেন।[৩০] ১২ ডিসেম্বর নেতৃবর্গকে গ্রেফতারের কারণে ঢাকা শহরে আলোকসজ্জা করা হয় এবং বিদেশী কাপড় পোড়ানো হয়।[৩১] ১৪ ডিসেম্বর হতে স্বেচ্ছাসেবকগণ জোড়ালোভাবে পিকেটিং আরম্ভ করেন।[৩২] ২৪ ডিসেম্বর যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস কলকাতায় আগমন করলে কলকাতার ন্যায় ঢাকাতেও হরতাল পালিত হয়।[৩৩]

১৯২২ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে গ্রেফতারকৃত নেতাদের বিচার শুরু হয়।[৩৪] ১২ জানুয়ারি অতুলচন্দ্র সেনের ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও প্রফুল্লচন্দ্রকে অব্যহতি দেয়া হয়। শ্রীশচন্দ্রের বিচার শেষ হয়। তবে রায় দেয়া হয়নি।[৩৫] ২৩ জানুয়ারি ঢাকায় সভা-সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরেও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করে। তাতে ৫০ ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হন।[৩৬]

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা

ময়মনসিংহ জেলায়ও খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন সক্রিয় ছিল। এ জেলায় যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাঁরা হলেন, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, মৌলভী তৈয়বুদ্দীন আহমদ, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, জহিরুদ্দিন, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, ডাঃ আক্কাস আলী, সূর্য্যকুমার সোম, ডাঃ বিপিন বিহারী সেন, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়, সুধীরচন্দ্র বসু ব্যারিস্টার, মতিলাল পুরকায়স্থ, মওলানা আজিজুর রহমান, মৌলভী আব্দুল হামিদ দেওপুরী, অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন, মৌলভী সাইদুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ বাঙালার অন্যতম প্রচারক খন্দকার মৌলভী আব্দুল হালিম আলমপুরী ও মৌলভী মকসুম আলী ময়মনসিংহ জেলায় পূর্ণ উদ্যমে খিলাফত ও জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে ওয়াজ নসীয়ত করেন।[৩৮]

এ জেলার ছাত্ররা স্কুল কলেজ ত্যাগ করেন। পল্লী সমিতি গঠিত হয়ে এর মাধ্যমে জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় ও তাঁতের স্কুল স্থাপিত হয়। ময়মনসিংহের বৈলর-ধানীখোলা দুই গ্রামের একই যুক্ত পল্লী সমিতি গঠিত হয়। জহিরুদ্দীন তরফদার সমিতির সভাপতি এবং শামসুদ্দীন সম্পাদক নিযুক্ত হন। আবুল মনসুর সাহেব উল্লেখযোগ্য সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। সমিতির খরচের জন্য গ্রামের ঘরে ঘরে মুষ্টির চাউল উত্তোলনের ঘট বসানো হয়।[৩৯] ভলান্টিয়াররা নিজের কাঁদে করে তা সংগ্রহ করে আনতেন। জেলা নেতৃবৃন্দের মাঝে মৌলভী তৈয়বুদ্দিন আহমদ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ সহ অনেকেই তাদের কাজ দেখতে আসতেন। বিভিন্ন স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হত। সভায় শহর হতে নেতৃবর্গ এসে বক্তৃতা করতেন। কর্মীরা গলাফাটিয়ে স্বদেশী গান ও খেলাফতী গযল গাইতেন।[৪০] ঐ সময় নিখিল ভারত খিলাফত কমিটি কর্তৃক আংগোরা (বর্তমানে আংকারা) তহবিল খোলা হয়েছিল যুদ্ধরত কামাল পাশাকে সাহায্য করার জন্য। ফেৎরার মত শিশু-বৃদ্ধ-নর-নারী নির্বিশেষে মাথা পিছু দু-পয়সা চাঁদা নির্ধারিত ছিল। এ এলাকার লোকেরা নিষ্ঠার সাথে চাঁদা প্রদান করায় ত্রিশ হাজার অধিবাসীর এ দুইয়ানা মিলিয়ে এক হাজার টাকা সংগ্রহ করে শামসুদ্দিন সাহেব এবং আবুল মনসুর সাহেব ঐ টাকার বুঝা মাথায় করে খিলাফত কমিটির নিকট জমা দিয়ে আসতেন।[৪১] আবুল মনসুর সাহেব জেলার খিলাফত কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তৈয়বুদ্দিন সাহেবের বাসায় ছিল খিলাফত নেতাদের বাসস্থান। টাকার অভাবে কংগ্রেস অফিসেরই এক কামরায় খিলাফত অফিস চলতো।[৪২] তখন ময়মনসিংহের কংগ্রেস-খিলাফত নেতৃবৃন্দ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত মতিলাল পুরকায়স্থ, মওলানা আজিজুর রহমান (নোয়াখালীর লোক ছিলেন), মৌলভী আব্দুল হামিদ দেওপুরী, অধ্যাপক মোয়াজ্জেম, আবুল মনসুর সহ অনেকে দল বেঁধে রাস্তায় বের হতেন। পথচারীরা তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে সালাম প্রদর্শন করতেন। রাস্তায় তাঁরা বক্তৃতাও করতেন।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ সালের ১৯ মার্চ দ্বিতীয় খিলাফত দিবস পালিত হবার সময় ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে খিলাফত বিষয়ক সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মফঃস্বল অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয় টাঙ্গাইলে। টাঙ্গাইল পার্কে আয়োজিত সভায় দেলদুয়ারের খ্যাতনামা জমিদার এবং স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্দুল হালিম গজনভী সভাপতিত্ব করেন। সভায় ৫০ হাজার লোকের সমাগম হয়। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ঐ সভায় অনলবর্ষী বক্তৃতা করেন।[৪৪]

মিত্রশক্তি যখন তুরস্ককে ভাগাভাগি করতে ব্যস্ত তখন নিজের বিপুল জমিদারীর ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনা না করে মৌলভী ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ভারতে পরিচালিত খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য সরকারের চক্ষুশুল হন। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ খিলাফত কমিটির সভাপতি। খিলাফত আন্দোলনের দায়ে ১৯২১ সালের ১৭ ডিসেম্বর শনিবার একদল সশস্ত্র পুলিশ তাঁকে গ্রেফতারের জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে করটিয়ায় উপস্থিত হন। সে সংবাদ আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার লোক তাঁর গ্রেফতারে বাধা দেওয়ার জন্য সমবেত হন। কিন্তু তিনি তাদের বারণ করে পুলিশের কাছে ধরা দেন। পুলিশ অফিসার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে তাঁকে এ মর্মে মুচলিকায় স্বাক্ষর করতে বলেন যে, তিনি যদি আন্দোলন থেকে সরে যান তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া তুলে নেবেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখান করেন। তাঁকে দেখার জন্য ১০ হাজার লোক সেখানে সমবেত হন। লোকের ভীড়ের মধ্যদিয়ে তিনি পাল্‌কীতে চড়ে পুলিশ দলের সাথে চললেন। রাস্তার দুদিক থেকে তাঁর প্রতি আকুল অভিবাদন জানানো হচ্ছিল। তিনি ক্রন্দনরত জনগণকে বলেছিলেন, "কেঁদোনা অপেক্ষা কর, সুদিন আসছে।" তাঁকে স্টীমারে জগন্নাথ গঞ্জ ঘাটে এবং ট্রেনযোগে সেখানে থেকে ময়মনসিংহ জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ময়মনসিংহ স্টেশনে তাঁকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য প্রায় ৩০ হাজার লোক সমবেত হয়েছিলেন। তাই ট্রেন জেলখানা বরাবর পৌঁছিলে দু'জন শ্বেতাঙ্গ লোক নিশান উঁড়িয়ে ট্রেন থামিয়ে তাঁকে চুপিসারে নামিয়ে চষাক্ষেত ভেঙ্গে জেলখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।[৪৫] প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ (তাঁর জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার এবং করটিয়া হাইস্কুলের হেডমাস্টার, পরে প্রিন্সিপাল) তাঁর সাথে জেলের ফটক পর্যন্ত গেলেন। প্রিন্সিপাল সাহেব তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

"বাতায়ন" গ্রন্থে ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর ঐসময়কার মনের ভাবাবেগ ব্যক্ত করে লিখেছেন, "আমি এতকাল চাঁদ মিয়া সাহেবের কাছে রইলাম, কোনদিন তাঁকে পা ছুঁয়ে ছালাম করি নাই। ওই সময় আমার মনে হল, আহা ঐ লোহার কপাটটা সামনে না থাকলে আজ ওঁর সামনে বসে পায়ের ধুলা মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরতাম।"[৪৬] ১৯২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে চাঁদ মিয়ার তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করবেন না – এ মর্মে দশ হাজার টাকার বণ্ড সই করারও তাঁকে আদেশ দেয়া হয়। তিনি সই না করায় তাঁকে আরো এক বছর শ্রমহীন কারাদণ্ড দেয়া হয়। কিছুদিন পর তাঁকে কলকাতার আলীপুর জেলখানায় স্থানান্তরিত করা হয়। কারামুক্তির প্রস্তাব দিয়ে সরকার তাঁকে বণ্ড সই করার প্রস্তাব দিলে তিনি অনড় রইলেন। কিছু দিন পর রমজানের শেষের দিকে তিনি ভয়ানক অসুস্থ্য অবস্থায় রোজা রাখতেন। এতে তাঁর শরীর আরো ভেঙ্গে পড়ে। অবস্থা শোচনীয় দেখে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট তাঁকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[৪৭] সাড়ে পাঁচ মাস কারাবরণের পর তাঁকে ১৯২২ সালের ২ জুন শুক্রবার ছেড়ে দেয়া হয়।[৪৮]

ময়মনসিংহের মুসলিম নেতাদের প্রতি উচ্চ অভিমত প্রকাশ করেন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। তাঁদের মাঝে বিশেষ করে নুরুল আমীন যিনি পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, রংপুরের আবুল হোসেন সরকার, জামালপুরে গিয়াস উদ্দিন আহামদ, ময়মনসিংহের আবুল মনসুর আহমদ, মৌলভী মুজিবর রহমান, আব্দুল হামিদ দেউপুরী, আব্দুল ওয়াহিদ, তাজউদ্দিন আহমদ, টাঙ্গাইলের চাঁদ মিয়া যাঁরা ১৯২১ সনে খিলাফত আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৪৯]

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা

ফরিদপুর জেলা খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী, পুর্নচন্দ্র মৈত্র বি. এল, যথনাথ পাল, মৌলভী অমিজউদ্দিন সরকার, পীর বাদশা মিঞা, সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সতীশচন্দ্র পাল রায় চৌধুরী, সতীন্দ্রনাথ সেন, অমলেন্দুদাস গুপ্ত, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, লাল মিয়া, মোহাম্মদ ইব্রাহীম।[৫০] ফরিদপুর জেলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিদেশী পণ্য বর্জন, কোর্ট-কাচারী বয়কট, জাতীয় বিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল কলেজ ত্যাগ শুরু হয়।[৫১] ১৯২০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর পূর্নচন্দ্র বি. এল-এর সভাপতিত্বে এক হাজার লোকের সমাগমে ফরিদপুর শহরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী, মোক্তার নাসীর উদ্দিন, আব্দুল গণি, মৌলভী তমিয উদ্দিন আহমদ এম. এ, বি. এল, যদুনাথ পাল, হেমেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি. এল খিলাফত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্যের জন্য একটি দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৫২]

১৯২১ সালের ২২ জানুয়ারি ফরিদপুর শহরে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে খিলাফত-অসহযোগের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় কলেজের অনেক ছাত্র যোগদান করেন। সভায় ফরিদপুরে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঘোষণা করা হয়।[৫৩] মার্চের ২য় সপ্তাহে জ্যোতিষচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ফরিদপুরের খালিয়া গ্রামে খিলাফত-অসহযোগের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শরৎকুমার চৌধুরী যিনি অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে আইন পেশা ত্যাগ করেন, তিনি পাঞ্জাবের সামরিক জুলুমের বর্ণনা দিয়ে বক্তৃতা করেন।[৫৪]

১৯২১ সালের ২৮ আগস্ট পীর বাদশা মিয়ার সভাপতিত্বে মাদারীপুর শহরের কালীবাড়ীর মাঠে খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৫৫] বাদশা মিয়াকে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন করার অভিযোগে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। তাঁকে কারাগারে নেওয়ার সময় ৫০ হাজার লোক জেলখানার দ্বার পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করেছিলেন।[৫৬] বিলেতী দ্রব্যবর্জনের সিদ্ধান্ত হবার পর তিনি কখনো বিলেতী দ্রব্য ব্যবহার করেননি এবং মৃত্যু পর্যন্ত খদ্দর ব্যবহার করতেন।[৫৭] তাঁর সম্পর্কে Indian Annual Register, 1922 তে বলা হয়,

"Pir Badsha Mian of East Bengal Sentenced at Faridpur to one year R. L. (rigorous imprisonment) for his khilafat activity huge crowd of 50 thousand Muslims followed him, but was prevailed upon to disperse in peace by Mr. Das and others."[৫৮]

মৌলভী তমিজউদ্দিন খাঁন তাঁর জমে উঠা আইন ব্যবসা ত্যাগ করে খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি ফরিদপুর জেলা খিলাফত কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের সময় তিনি একদল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। ঐ বাহিনীকে সরকার বে-আইনী ঘোষণা করেন এবং এর দায়ে ১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং চৌদ্দমাস তাঁকে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।[৫৯] ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত পাংশা গ্রামের আধিবাসী মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী একজন সংগঠক হিসেবে পাংশার মুসলমানদেরকে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের জন্য সংগঠিত করেন।[৬০]

বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা

চট্টগ্রাম জেলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিভিন্ন স্থানে মিটিং-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা স্কুল কলেজ বয়কট করেন। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে কারাবরণ করেন। চট্টগ্রাম District Gagetteers এ বলা হয়, "In the memorable khilafat and Non-cooperation Movement Chittagong took very active part and there was complete unity between the Hindus and the Muslims. They joined hand in hand and courted jail in thousands(?). Schools and colleges were deserted. processions and meetings were common sights everywhere and the atrocities by the police and the military action on the people become a regular feature .... The district was one of the centres, Leading Bengal in movement in all spheres"[৬১]

চট্টগ্রাম খিলাফত-অসহযোগ নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা মনিরুজ্জামান সারকাইতী, কাজেম আলী মাস্টার, মওলানা ওজিহ উল্লাহ (সন্দ্বীপ), মওলানা সাইয়েদ আহমদ (সন্দ্বীপ), মওলানা ফররোখ আহমদ নিযামপুরী, নজীর আহমদ চৌধুরী, আলী আহমদ ওয়ালী ইসলামাবাদী, শাহ মুহম্মদ বদিউল আলম, মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ (সন্দ্বীপ), আব্দুর রশিদ সিদ্দিকী, শাহ মাযহারুল আলম, মৌলভী সাহেব মিয়া, ফরিদ মিয়া ও যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।[৬২]

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী চট্টগ্রামে একটি জাতীয় আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ে প্রচুর জমি সংগ্রহ করেন। ঐ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ-বাংলা ভূমিকা রাখে।[৬৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯২১ সালের ৪ মে খিলাফতের জন্য চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ছোলতান পত্রিকায় বলা হয়, "চট্টগ্রাম খিলাফত ও স্বরাজ আন্দোলনে ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।"[৬৪]

১৯২১ সালের ৫ মে যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তকে দাঙ্গার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯ অক্টোবর ১৭ জন কর্মীসহ তাঁকে ৩মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। ৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলা খিলাফত কমিটির সেক্রেটারি মৌলভী নজীর সহ কতিপয় খিলাফত কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়।[৬৫] ডিসেম্বর মাসে ৭০ জন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং করার সময় ২০ জনকে গ্রেফতার এবং চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি প্রসন্নকুমার সেনকে ১ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মৌলভী সাহেব মিয়া ও বাঁশখালীর জমিদার ফকির মিয়াকে ২ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। শাহ বদিউল আলমকে ১ এপ্রিল গ্রেফতার করা হয়।[৬৬]

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী "ছোলতান" পত্রিকায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে বহু প্রবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের উঁচুমানের নেতা। তিনি শুধু চট্টগ্রামেই নয় বাংলার বহু স্থানে সভা-সমিতিতে খিলাফতের পক্ষে জোড়ালো বক্তৃতা করেন এবং আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।[৬৭]

চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে খিলাফতের বহু সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সন্দ্বীপ খিলাফত কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন, যথাক্রমে মওলানা শামসুল হক ও সেকান্দর হোসেন মিয়া। সন্দ্বীপে বিলাতী দ্রব্য বর্জন, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ ত্যাগ ও স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের জন্য কংগ্রেস ও খিলাফতের ডাকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। কংগ্রেস ও খিলাফত অফিসে, কার্গিল হাইস্কুলে এবং সন্দ্বীপের বহু ঘরে ঘরে চরকায় সুতা কেটে খদ্দর তৈরী হয়েছিল। চন্দ্রকান্ত দাস "সন্দ্বীপ" নামের কাপড় ধোঁয়ার সাবান বাজারে ছেড়ে ছিলেন।[৬৮]

সর্বজন শ্রদ্ধেয় মওলানা ওজিহউল্লাহ অসহযোগ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি চারআনির হাটে নিজ গায়ের শেরওয়ানী পুড়িয়ে সন্দ্বীপে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন।[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা

নোয়াখালী জেলার জনগণ খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। জেলার বিভিন্ন স্থানে খিলাফতের জন্য সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল-কলেজ বর্জন, বিদেশী দ্রব্য বয়কট, স্থানে স্থানে তাঁত কল ও বস্ত্রবয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিদেশী পন্য পুড়িয়ে দেয়া, হরতাল ইত্যাদি কর্মসূচী পালিত হয়। অনেকে চাকুরী ত্যাগ করেন। নোয়াখালী জেলা খিলাফত কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারি ছিলেন যথাক্রমে হাজী আব্দুর রশীদ ও মৌলভী ইব্রাহীম।[৭০] হাজী আব্দুর রশীদ ছিলেন, নোয়াখালী জেলাবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ও জমিদার। তিনি ১৯২০ সালের ২৭ জুলাই খিলাফত আন্দোলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে "খানসাহেব" উপাধী এবং অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ও গভ: হাইস্কুল কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন।[৭১]

সভাপতি ও সেক্রেটারি ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে যাঁরা নোয়াখালী জেলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্বদেন তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, শাহ গোলাম সরওয়ার, মওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ দেওবন্দী রায়পুরী, মওলানা ওয়াজিউল্লাহ, মৌলভী মুমতাজুল করীম, গোলাম রহমান, আব্দুস সোবহান, সৈয়দ আহমদ (লক্ষীপুর), নাসীর আহমদ (লক্ষীপুর), মৌলভী আজিজুল্লাহ, আব্দুল জব্বার খন্দর, ক্ষীতিশচন্দ্র রায় চৌধুরী, মথুরানাথ চক্রবর্তী, শুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, অনুতোষচন্দ্র সেন, বৈকুণ্ঠচন্দ্র পাল, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।[৭২] আন্দোলনের দায়ে অনেকেই গ্রেফতার হন। বিচারে হাজী আব্দুর রশিদ খান, মৌলভী মুহম্মদ ইব্রাহীম, নগেন্দ্র গুহ রায়, ক্ষীতিশচন্দ্র রায় চৌধুরী সহ অনেকে কারাবরণ করেন।[৭৩]

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সময় নোয়াখালীতে চিত্তরঞ্জনদাস, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী প্রমূখ নেতৃবর্গ আগমন করে আন্দোলনের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করেন। চিত্তরঞ্জন দাসের নোয়াখালী আগমন উপলক্ষে ১৯২১ সালে মার্চ-এর "ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকায় বলা হয়,

"১৯২১ সালের ১৯ মার্চ শনিবার চিত্তরঞ্জন দাস নোয়াখালীর বি. কে. জুবলী স্কুল কমপাউণ্ডে খিলাফত-অসহযোগ ইস্যুতে এক সভা করেন। সভায় ঘোষণা করা হয় যে,

Dhaka University Institutional Repository

নোয়াখালীর উকিল রাজমোহন মুখার্জী, বাবু হরেন্দ্রকুমার সেন, বাবু উপেন্দ্রমোহন ঘোষ উকালতি ছাড়বেন এবং বাবু রামচরণ চক্রবর্তী মোক্তারী ত্যাগ করবেন।"

নোয়াখালীর ছাত্র ধর্মঘট সম্পর্কে ১৯২১ সালের ২৩ জানুয়ারি তারিখের "ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকায় বলা হয় যে,

"১৮ জানুয়ারি, ১৯২১ নোয়াখালীর আহমদিয়া হাই মাদ্রাসা ও ইসলামিয়া মাদ্রাসার ছাত্রগণ এবং অরুনচন্দ্র হাইস্কুল ও জুবিলী হাইস্কুলের কিছু ছাত্র ক্লাশ বর্জন করেন। তাঁরা রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করেন। ঐ অবস্থা দেখে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসা বন্ধ করে দেন।"[৭৪] ৭ নভেম্বর নোয়াখালীর টাউন হলে রজনীকান্ত বসুর সভাপতিত্বে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও করাচীর প্রস্তাব সমর্থনের জন্য এক অসহযোগ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিতিরা সকলেই দাঁড়িয়ে করাচী প্রস্তাব সমর্থন দেন। সভায় বিলেতী টুপী ও কাপড়-চোপড় পোড়ানো হয়।[৭৫]

নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ১৪৪ ধারা জারী করে শহরের ৫ মাইলের মধ্যে সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৭৬] নোয়াখালীর District Gazetteers এ খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বলা হয়:-The movement got momentum in this district when Maulana Muhammad Ali and Maulana Shawkat Ali paid a visit to the district. The movement was organised in this district under the leadership of Hazi Abdur Rashid Khan and Maulana Muhammadullah Deobandi of Raipur. .... The local congress and khilafat leaders preached their ideals and organised congress and khilafat committee even in villages in the interior. The students and teachers boycotted the schools and Madrassahs. Some new national educational institutions were established without any help or grant-in-aid of the Government. Many Government employees came out of their offices and participated in national movement. British made goods were also boycotted by the people. Weaving schools were started in different parts of the district by individuals. The Muslims and Hindus jointly took part in

Dhaka University Institutional Repository

the khilafat and swaraj movement. The speeches delivered by the leaders excited the people against Government and many leaders and workers were arrested. Hartals were observed everywhere to protest against the action of Government.[৭৭]

বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা

কুমিল্লা জেলায়ও খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন প্রবলভাবে চলতে থাকে।[৭৮] কুমিল্লা জেলার খিলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী ও সেক্রেটারি ছিলেন আফতাব-উল-ইসলাম মজুমদার।[৭৯] ১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমন উপলক্ষে ভারতের অন্যান্য এলাকার মত কুমিল্লাতেও হরতাল ঘোষিত হয়। বাংলাদেশ সরকার এতে বে-আইনী ঘোষণা করলে কুমিল্লা কান্দির পাড়ে অবস্থিত কংগ্রেস অফিস থেকে আশরাফ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকদের একটি মিছিল বের হয়। বিদ্রোহী কবি কাজী নরজুল ইসলাম তখন কুমিল্লায় অবস্থান করছিলেন। তিনিও গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে মিছিলের পুরোভাগে থেকে বিদ্রোহী গান গেয়েছিলেন। আশরাফ উদ্দিন ও নজরুলকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রতিদিন কান্দির পাড় থেকে মিছিল বের হয়। সরকারের দমননীতিও চলতে থাকে।[৮০] এর পরেও নজরুল হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বিদ্রোহী গান গাইতেন।[৮১]

কুমিল্লা জেলায় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য নেতৃবর্গ ছিলেন, আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, আফতাব-উল-ইসলাম মজুমদার, অখিলচন্দ্র দত্ত, হরদয়াল নাগ, অতীন্দ্রমোহন রায়, হাবিবুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাস কুমিল্লা এসে কুমিল্লা বারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন। এতে অসহযোগ আন্দোলন আরো জোড়ালো হয়।[৮২]

কুমিল্লা শহরের মওলানা মোহাম্মদ শকীর সভাপতিত্বে খিলাফত সম্পর্কে ত্রিপুরা উলামা কনফারেন্সের এক অধিবেশনে দুই হাজার লোক যোগদান করেন। কনফারেন্সে বলা হয়, "হিন্দু-মুসলমান একত্রে কাজ করুন এবং উলামার নির্দেশ অনুসারে খিলাফত ও স্বরাজের পথে অগ্রসর হউন। কারণ উলামাই ইসলাম ধর্মের প্রকৃত প্রচারক।"[৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের দায়ে আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী দুই সপ্তাহের কারাদণ্ড ভোগ করেন।[৮৪]

ফেনী সদর থানার দেবীপুর গ্রামের অধিবাসী মৌলভী আব্দুর রাজ্জাক খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেন।[৮৫]

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কুমিল্লা District Gazetteers এ বলা হয়, "The people of this district then participated in Non-cooperation movement and khilafat movement in 1920-21 A.D."[৮৬]

বৃহত্তর সিলেট জেলা

সিলেটের যে সমস্ত আলিম খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কারাবরণ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন, মওলানা আব্দুল হক চৌধুরী মোক্তারপুরী, মওলানা আব্দুল মুসাব্বির চৌধুরী গওহরপুরি, মওলানা সাখাওয়াত আম্বিয়া রকিপুরী, মওলানা আবু সাঈদ চৌধুরী চুড়খাই, মওলানা আব্দুস সোবহান চৌধুরী ভাদেশ্বরী, মওলানা আব্দুল মুকিত চৌধুরী রনীকেলী, মওলানা রিয়াজদ্দীন ঘড়গাঁও, মওলানা সায়েফুল্লাহ রাইয়াপুরী, মওলানা সৈয়দ বাহেদুদ্দীন ভাদেশ্বরী, মওলানা খুরশেদ আলী ইন্দেশ্বরী, মওলানা খলিলুর রহমান দৌলতপুরী, মওলানা সৈয়দ জামিলুল হক সৈয়দপুরী, মওলানা আব্দুর রশীদ লক্ষীপাশা, মওলানা ইব্রাহীম চতুলী, মওলানা আব্দুল লতিফ ছাতকী, মওলানা বুরহানুদ্দীন সিঙ্গের কাছ, মওলানা আব্দুল হামিদ বাহুবল, মওলানা আব্দুল বারী ঝিঙ্গাবাড়ী, মওলানা গোলাম রহমান বানিয়াচং, মওলানা আনজব আলী জৈয়িন্তাপুরী, মওলানা আব্দুর রহমান সিংকাপনী, মওলানা সেকান্দর আলী বানিয়াচং, মওলানা খুরশেদ আলী করিমগঞ্জ, মওলানা আব্দুল মুকতাদির চৌধুরী ফুলবাড়ী, মওলানা জামালুদ্দীন আহমদ ঘোষ গ্রাম, মওলানা আহম্মদ আলী করিমগঞ্জ, মওলানা সৈয়দ নযীরুদ্দিন।[৮৭]

মৌলভী আব্দুল লতিফ লুতফী সিলেট জেলায় খিলাফত, সমাজ সংস্কার, অসহযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক প্রচার করেন।[৮৮]

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট জেলার কানাইঘাট থানার বাটাশাইলের মওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল আলম খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঐ সময় অন্ধ ছিলেন। তথাপি আন্দোলনের পক্ষে তিনি বহু কবিতা লিখেন।[৮৯] মওলানা ইসমাইল আলমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা মুহাম্মদ তিশনা ছিলেন বিশিষ্ট আলিম, বক্তা ও কবি। তিনি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সভাপতিত্বে কানাইঘাটের ভোলাইচর মাঠে এক খিলাফত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভা ভঙ্গ করার জন্য সিলেটের ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ বাহিনী পাঠান। পুলিশের অত্যাচারে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। সভাস্থলে গুলি চালানো হয়। এতে ৭ ব্যক্তি নিহত এবং ২৭ ব্যক্তি আহত হন। বংকিম ও বিহারী নামে দুজন পুলিশও নিহত হন। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মওলানা তিশনা হৃদয় বিদারক কবিতা রচনা করেন।[৯০] কানাইঘাট থানার রাণীগুবামের মওলানা আনজম আলী খিলাফত আন্দোলনের পক্ষে বহু উর্দু কবিতা রচনা করেন।[৯১]

বৃহত্তর রাজশাহী জেলা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আহ্বানে এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাজশাহী জেলায় অসহযোগ আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। ছাত্র-শিক্ষক স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করেন।[৯২]

আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ-বাংলা এর অন্যতম প্রচারক মৌলভী আব্দুল হালিম আলমপুরীকে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে কাজ করার জন্য ময়মনসিংহ থেকে রাজশাহীতে প্রেরণ করা হয়। তিনি রাজশাহীকে কেন্দ্র করে পাবনা ও বগুড়া জেলার পশ্চিম-দক্ষিণাংশে খিলাফত, সমাজ সংস্কার ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে প্রচারকার্য চালান।[৯৩]

বৃহত্তর পাবনা জেলা

পাবনা জেলার খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছে সলঙ্গা হাটের মর্মান্তিক ঘটনার জন্য। এ জেলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

নেতারা ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মোহাম্মদ সেরাজুল হক, মওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ প্রমুখ।[৯৪]

ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলকান যুদ্ধের সময় ডাঃ আনসারীর নেতৃত্বে তুরস্কে প্রেরিত মেডিক্যাল টিমের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তখন তিনি প্যানইসলামী ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে তুরস্ক সফরের অভিজ্ঞতার আলোকে "তুরস্ক ভ্রমণ" শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৯৫] তিনি সিরাজগঞ্জের খিলাফত ও অসহযোগ কমিটির সভাপতি ছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বে ১৯২১ সালের ২৫, ২৬, ২৭ সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তিনি বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বরাজ লাভের পন্থা, খিলাফত পুনরুদ্ধার ও আংকারায় অর্থ সাহায্য প্রেরনের জন্য আলোচনা করেন এবং আংকারার সাহায্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য এক প্রকার পত্রও প্রকাশ করেন।[৯৬] ইসমাইল হোসেন সিরাজী সম্পর্কে পাবনা District Gazetteers এ বলা হয়, "At the time of the Non-cooperation, Ismail Hussain Sheraji (1881-1931), a proud son of this district, stirred his countrymen by his speeches and writings, to join the movement for swaraj."[৯৭]

মওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাবনার সলঙ্গা হাটে বিদেশী পণ্য ক্রয় না করার জন্য পিকেটিং করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। তাতে পুলিশের গুলিতে অনেক লোক মারা যান এবং অনেকে আহত হন।[৯৮]

বৃহত্তর বগুড়া জেলা

বগুড়া জেলায় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে সংগঠিত করেন মৌলভী আশরাফ আলী (ধুনট) ও ডাঃ শের আলী। সৈয়দ আব্দুল করীম দাউদীর চেষ্টায় খিলাফত আন্দোলন সমগ্র জেলায় বিস্তার লাভ করে। ১৯২১ সালে বগুড়া জেলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন জোড়ালো হয়। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য নেতারা ছিলেন মৌলভী আশরাফ আলী (ধুনট), ডাঃ শের আলী, সৈয়দ আব্দুল করীম দাউদী, সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, যতীন্দ্র মোহন রায়, রাজিব উদ্দিন তরফদার, কবিরাজ শেখ আব্দুল আজিজ, ইসহাক গোকুলী, মৌলভী নাদের আলী, নাসির উদ্দিন, ফরমান আলী, বেড়ের বাড়ীর আব্দুল জব্বার প্রমুখ।[৯৯]

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর রংপুর জেলা

অন্যান্য জেলার ন্যায় রংপুর জেলায়ও হিন্দু-মুসলমান মিলিত হয়ে খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। শাহ আব্দুল হামিদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাশে পড়ার সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ডাকে সাড়া দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে আন্দোলনে যোগদান করে রংপুর জেলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[১০০]

"আল-এসলাম" পত্রিকায় ১৯২১ সালের জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় "আঞ্জুমান সংক্রান্ত সংবাদ" এর শিরোনামে লেখা হয় যে,

"আঞ্জুমানের রাজশাহী বিভাগের সেক্রেটারি মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী ছাহেবের খেলাফত বিষয়ে জোর আন্দোলন ও প্রাণপন চেষ্টার ফলে রংপুর জেলায় আশাতীত ফল হইয়াছে।"[১০১]

বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা

১৯২০ সালের ১৯ মার্চ দ্বিতীয় খিলাফত দিবস পালিত হলে দিনাজপুরেও হরতাল, শোভাযাত্রা প্রতিবাদ সভা সহকারে ব্যাপকভাবে দ্বিতীয় খিলাফত দিবস পালিত হয়। ঐ সভাকে সম্পূর্ণরূপে সফল করার লক্ষ্যে ১৮ মার্চ উকিল সতীশচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় নাট্য-গৃহে এক উপদেষ্টা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় হরতালকে সফল করার জন্য হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে যে মনোভাব ব্যক্ত করেন, তা দিনাজপুরে বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।[১০২]

১৯২০ সালের ১ আগস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী, মওলানা আব্দল্লাহেল কাফী, মওলানা মনিরুদ্দিন আনওয়ারী, মওলানা আব্দুর রহমান সাঈদী, আফতাব উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কর্মপ্রচেষ্টায় পুরোপুরিভাবে হরতাল সহকারে তৃতীয় খিলাফত দিবস পালিত হয়। সেদিন দিনাজপুর শহরের রেলবাজার হাটও বসেনি। জেল খানা মসজিদ প্রাঙ্গণে খিলাফত সভায় নেতাগণ সরকারের বিরুদ্ধে দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।[১০৩]

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর থানাধীন রানীরবন্দর গ্রামের মওলানা মনীরুদ্দীন ১৯১৯ সালে শিক্ষকতা ছেড়ে খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি আংকারার সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

করে আব্দুল্লাহেল বাকীর মাধ্যমে তুরস্কে পাঠান।[১০৪] তিনি ১৯২০ সালের বালুর ঘাটের এক জনসভায় সরকার বিরোধী বক্তব্যের জন্য গ্রেফতার হন এবং ৬ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য হাজার হাজার লোক জেলখানার গেটে সমবেত হয়েছিলেন।[১০৫] এ সময় প্রতিটি মুসলমান সভা কার্যত খিলাফত সভায় পরিণত হতো।[১০৬]

অসহযোগ আন্দোলনে দিনাজপুরের হিলি অঞ্চলের একজন একনিষ্ঠ নেতা আফতাব উদ্দীন চৌধুরী হিলিবাসীদের মধ্যে বিলেতী দ্রব্য বর্জন কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন সভা-সমাবেশের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালান।[১০৭]

দিনাজপুর জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়, এ জেলার মুসলমানরা খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ আন্দোলন সুদুর গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে। জেলার মুসলমান ও হিন্দুরা একযোগে ১৯২০ সালে খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে মুসলমান সত্তাকে সক্রিয় খিলাফত পার্টিতে রূপান্তরিত করে। মৌলভী ইয়াকিন উদ্দিন বি. এল., মৌলভী ওয়াহিদ হোসেন বি. এল., মৌলভী কাছির উদ্দিন বি. এল., মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী, মওলানা আব্দুর রহমান সা'দী ও মওলানা আব্দুল্লাহ ছিলেন জেলার খেলাফত আন্দোলনের নেতাদের অন্যতম। তাঁদের বক্তৃতা বিবৃতির ফলে জনসাধারণ ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং খিলাফত আন্দোলন সুদূর গ্রামে সম্প্রসারিত হয়। বাকী ও কাকী ভ্রাতৃদ্বয় কয়েকদফা কারাবরণ করেন। মওলানা মনিরউদ্দিন আনওয়ারীকে এক সভা থেকে গ্রেফতার করার সময় জেল গেটে বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম হয়। ১৯২০ সালে দিনাজপুরে মুসলমানদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ সভা পাঁচদিন ধরে চলে। প্রথম দু'দিনের বৈকালিক অধিবেশনের (২০ ও ২১ চৈত্র) উদ্যোক্তা ছিলেন "মুসলিম শিক্ষা সমিতি" আর তাতে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন আব্দুল করিম বি. এ (অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক)। তৃতীয় দিনের সকাল ও বিকেলের অধিবেশনের আয়োজন করেছিলেন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মৌলভী মুজিবর রহমান (কলকাতার "মুসলমান" পত্রিকার সম্পাদক) এবং মৌলভী ওয়াহিদ হোসেন বি. এল। চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনের উদ্যোক্তা ছিলেন "আহলে হাদিস" আর মওলানা আকরাম খান ও মিশর থেকে আগত একজন মওলানা

Dhaka University Institutional Repository

এতে ভাষণ দিয়েছিলেন। মিশরীয় মওলানার আরবী ভাষার বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী।[১০৮]

১৯২১ সালের দিকে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের গতিবিধির উপর সরকার নজর রাখতে থাকেন। ঐ বছর মার্চ-এপ্রিলের দিকে উগ্র-গণআন্দোলন আরম্ভ হয়। চারদিকে রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করে। জেল খানার কয়েদীরা পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠে।[১০৯]

বৃহত্তর খুলনা জেলা

খুলনাতেও খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হয়। খুলনায় নেতৃত্বের সিংহভাগে ছিলেন, ডুমুরিয়ার মওলানা আহমদ আলী ও তালার সৈয়দ জালাল উদ্দিন হাশেমী।[১১০] এছাড়া সাতক্ষীরার মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী খেলাফত কমিটির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের মতানুসারে প্রয়োজনে অন্যান্য নেতাদের কঠোর সমালোচনা করতেও দ্বিধা করতেন না।[১১১] কয়েকজন মহিলা নেত্রীও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভবানী সেন ও স্নেহশীলা চৌধুরী ছিলেন উল্লেখযোগ্য।[১১২]

বৃহত্তর যশোর জেলা

সৈয়দ মজীদ বখ্‌শ যিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন, খন্দকার মতিউর রহমান, কৃষ্ণশাহা, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্নেহশীলা চৌধুরী, খন্দকার মতিয়র রহমান প্রমুখের নেতৃত্বে যশোরে খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।[১১৩]

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও পূর্ণচন্দ্র দাসের সহযোগিতায় ১৯১৯ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে "সার্ভেন্ট" নামক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।[১১৪] স্নেহাশীলা চৌধুরী বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে মহিলাদেরকে বিলাতী পণ্য বর্জনের পরামর্শ দেন।[১১৫]

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা

কুষ্টিয়া জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্রশক্তি কর্তৃক তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগ করার বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া জেলার মুসলমানরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে। এ জেলায় সুদূর গ্রামাঞ্চলেও এই খিলাফত আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের অন্যান্য প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দ মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, ড. কিচলু এবং ডাঃ আনসারী এ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কুষ্টিয়াতে আগমন করেন। ১৯২০ সালে কুষ্টিয়ার বিখ্যাত নেতা শামসুদ্দিন আহমদ খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি বঙ্গীয় খিলাফত পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২০ সালে এ জেলাসহ সমগ্র বঙ্গদেশে খেলাফত আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। এ আন্দোলন ব্রিটিশ শাসন বিরোধী একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসন বিরোধী নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এ জেলার আফছার উদ্দিন আহমদ ও শামসুদ্দিন আহমদ ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেফতার করা হয়।[১১৬]

এ আন্দোলনের সময় কুষ্টিয়া জেলার গ্রামে গঞ্জে সভা-সমিতি ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। আফছার উদ্দিন ও শামসুদ্দীন ভ্রাতৃদ্বয়, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঐ সমস্ত সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে আন্দোলনকে বেগবান করে তোলেন। তুরস্কে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য অনেক স্বেচ্ছাসেবকও তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে অনেক মুসলমান ধুতি পরতেন। কিন্তু খিলাফত আন্দোলন কালে তাঁরা লুঙ্গী-পায়জামা-পাঞ্জাবি এবং মাথায় তুর্কী ফেজ টুপি পড়তে আরম্ভ করেন।[১১৭] খিলাফত কর্মীরা শহরে শহরে ও গ্রামেগঞ্জে মিছিল করে জাতীয় প্রেরণামূলক গান গেয়ে বেড়াতেন।

এ জেলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন মৌঃ শামস উদ্দীন আহমদ, মৌঃ আফছার উদ্দীন আহমদ, হেমন্তকুমার সরকার, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী, ফতেহ্ চাঁদ লাহটা প্রমুখ। মাঝে মাঝে বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দদাস কুষ্টিয়ায় গিয়ে খিলাফতী গান গাইতেন। তাঁর গানের এক আসরে লক্ষাধিক শ্রোতার সমাবেশ হয়েছিল বলে জানা যায়।[১১৮]

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর বরিশাল জেলা

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সময় বরিশালের শহরকেন্দ্রীক রাজনীতির গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ প্রদত্ত উপাধি, স্কুল-কলেজ বর্জন ও বিলেতী দ্রব্য বয়কট আন্দোলন চলতে থাকে।[১১৯]

বরিশাল খিলাফত আন্দোলন শুরু হয় ১৯২০ সালে। বরিশাল খিলাফত কমিটির সভাপতি হন খানবাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন আহমদ, সহ-সভাপতি হন উকিল মৌ. আসগর আলী এবং সেক্রেটারি হন উকিল হাশেম আলী। খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন খানবাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন, হাশেম আলী খান, উকল আসগর আলী। উলানিয়ার ওয়াহেদ রেজা চৌধুরী, সুলতান আহমদ চৌধুরী (বাদশামিয়া চৌধুরী), কসবার মাজেদ কাজী, সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, ওবায়েদুল গনি চৌধুরী, উকিল মফিজ উদ্দিন, উকিল সৈয়দ আলী হোসেন, খান সাহেব হাতেম আলী জমাদার, গুলিশাবালির আজহার উদ্দিন আহমদ, বরগুনার আব্দুল কাদের লাল মিয়া, বেতাগীর আবি আব্দুল্লাহ, পটুয়াখালীর উকিল ফজলে করিম ফজুমিয়া, উকিল মোহাম্মদ আকরাম, এমদাদ মোক্তার, ভোলার কবি মোজাম্মেল হক, খানবাহাদুর নুরুজ্জামান মোক্তার, নুর আহমেদ শিকদার, মওলানা নাসীর উদ্দিন, কলস কাঠির হাশেম তালুকদার, পিরোজপুরের সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল মোক্তার, চৌধুরী ইসমাইল খান প্রমুখ। এ আন্দোলনে অনেকে গ্রেফতার ও কারাবরণ করেন।

১৯২১ সালে বরিশালে খিলাফত আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয়। এ অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য উজিরপুরের প্যারীলাল রায় ও গুরুচরণ আইচকে যথাক্রমে সভাপতি ও সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। এ আন্দোলন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েরাও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন, শরৎকুমার ঘোষ, গরৎ গুহ, হাশেম আলী খান, ওয়াহেদ রেজা চৌধুরী, নগেন্দ্র ভট্টাচার্য, সতীন্দ্র সেন, ড. তারিনীগুপ্ত, মনোরঞ্জন গুপ্ত, চারণ কবি মুকুন্দ দাস প্রমুখ। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের দায়ে বরিশালের প্রায় ৫০০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। সতীন্দ্রনাথ সেন বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য একটি যুববাহিনী গঠন করেন।[১২০]

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা প্রকাশে এ বলা হয় যে, তএত্য রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে ১৯২০ সালের ১৪ মার্চ হিন্দু-মুসলমানদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উকিল হরনাথ ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। খানবাহাদুর মৌলভী হেময়েত উদ্দিন মহাত্মা গান্ধীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন সমর্থন করে বলেন,

"তুরস্ক-সন্ধির সুমীমাংসা না হলে তা অবলম্বন করতে হবে।"[১২১] ১৯২১ সালের মার্চ মাসে বরিশালে বিপিনচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিপিনচন্দ্র পাল গান্ধীজির অসহযোগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করেন। শরৎকুমার ঘোষ ও হাসেম আলী খান দেশবন্ধুকে সমর্থন করেন। এ সভায় বরিশালের উকিল মোক্তারদের ৩ মাসের জন্য কোর্ট বর্জনের আহ্বান জানালে বড়দাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপতিকান্তবক্সী, দীনবন্ধু সেন, হাশেম আলী খান প্রমুখ উকিল- মোক্তারগণ তিন মাসের জন্য আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। আইন ব্যবসা ত্যাগ আন্দোলনে হাশেম আলী খান নেতৃত্ব দেন। তাই সরকার তাঁর সনদ কেড়ে নেন।[১২২]

১৯২১ সালে জুন মাসে সি. আর. দাস, তাঁর স্ত্রী বাসন্তী রাণী ও যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত নৌকা যোগে গোয়ালন্দ থেকে বরিশালে আসলে বরিশালে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য সি. আর. দাসকে তাঁদের তহবিল থেকে ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

১৯২১ সালের ২ সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধী এবং মওলানা মোহাম্মদ আলীর আগমনে বরিশালের বি. এম. স্কুল প্রাঙ্গনে খিলাফত-অসহযোগের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[১২৩]

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে বরিশালে স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করা সহ হাটেবাজারে পিকেটিং করে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও দেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রচারণা চালানো হয়। ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, রহমতপুর, গৈলা, ঝালকাঠি, বানরিপাড়া প্রভৃতি স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলটি জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।[১২৪]

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের দায়ে যাঁরা জেল-জরিমানা সহ কারাবরণ করেন, তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, শরৎকুমার ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, সরলকুমার দত্ত, নগেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য, প্যারীলাল রায়, নিশিকান্ত গাঙ্গুলী, সতীন সেন, ওয়াহেদ রেজা চৌধুরী, নূর আহমদ, মকবুল মিয়া, নলিনী দাস, শৈলেন্দ্রনাথ দাস, ফজুমিয়া প্রমুখ। শরৎকুমার ঘোষের

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেফতারের প্রতিবাদে হিন্দু-মুসলমান "বন্দেমাতরম" ও "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি দিয়ে প্রতিবাদ করেন। বি. এম. স্কুল মাঠে ওয়াহেদ রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা হয়। শহরে সাতদিন ধরে হরতাল চলতে থাকে। পিরোজপুরেও দুদিন হরতাল হয়। বিচারে শরৎকুমার ঘোষের তিন মাস জেল ও দু'শত টাকা জরিমানা হয়। এর প্রতিবাদে রাজা বাহাদুরের হাবলীতে এক জনসভা হয়। ১৯২২ সালের ১৫ জানুয়ারি তিনি মুক্তি লাভ করেন।[১২৫]

পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি স্থান

পশ্চিম বঙ্গের খিলাফত-অসহযোগ সংগঠন গড়ে উঠেছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলার খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবর্গ কলকাতা থেকেই আন্দোলন পরিচালনা করতেন এবং নেতৃত্ব দেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকি, মওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা আহম্মদ আলী, মৌলভী আবুল কাশেম, মওলানা আব্দুর রাজ্জাক মালীহাবাদী, মৌলভী মুজিবর রহমান, হাকিম মওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী, আল্লামা রাগিব আহসান, হাকিম সাইদুর রহমান, মৌঃ সৈয়দ মজিদ বক্স, এডভোকেট ওয়াহিত হোসেন, মৌলভী আব্দুর রহমান, চিত্তরঞ্জন দাস, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, অম্বিকা প্রসাদ বাজপাই, মিসেস বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, বি. চক্রবর্তী, এস. চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার মিত্র, প্রফেসর জে. এল. ব্যানার্জী, হেমন্ত কুমার বসু প্রমুখ।[১২৬]

এছাড়াও ফুরফুরার মওলানা শাহ্ সুফী আবুবকর সিদ্দীকী (রহঃ) খিলাফতের সমর্থক ছিলেন। তিনি তুরস্কের খলিফাকে সমগ্র মুসলিম জাতের সর্ববাদীসম্মত প্রতিনিধি ও মনোনীত খলিফা মনে করতেন। কিন্তু তিনি অসহযোগের বিরোধী ছিলেন। তিনি এমন কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন না যাতে ব্রিটিশ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে দেশে শান্তির ব্যাঘাত বা রক্তপাত ঘটাতে পারেন।[১২৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ সালের এপ্রিল-মে সংখ্যায় "ইসলাম দর্শন" পত্রিকায় আবুবকর সিদ্দীকী (রহঃ) বলেন,

"অধুনা খিলাফত আন্দোলনে সমগ্র মোসলেম জগৎ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মোসলেমীন মহামান্য রুমের সুলতানের বিপদে প্রত্যেক মুসলমানই অন্তরে অসহ্য বেদনা অনুভব করিতেছেন। এরূপ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিশেষতঃ মহামান্য সুলতান সমগ্র মোসলেম জগতের সর্ববাদীসম্মত প্রতিনিধি ও মনোনীত খালিফা। খেলাফত ইসলামের এক বিশিষ্ট ধর্মগত পদ্ধতি। .... ইহা মান্য করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ওয়াজেব অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য – না মানা ধর্মদ্রোহিতা।"[১২৮]

তিনি ঐ পত্রিকায় ১৯২০ সালের অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায় খিলাফত সম্পর্কে বলেন, "আমি বিশেষভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হিতাকাংখীরূপে বলিতেছি যে, তাঁহারা ও অন্যান্য ইতিহাসজ্ঞ সকলে অবশ্য জানেন, সমস্ত মোসলমানগণের এইরূপ ধর্মবিশ্বাস যে, মোসলমানদিগের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা কবিরা গুনাহ এবং পলায়নকারীর অবস্থান জাহান্নাম।

... গভর্নমেন্ট আরো জানেন যে, মোসলমান শান্তিপ্রিয় ধর্মভীরু জাতি। কিন্তু তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত লাগিলে তাহারা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া গভর্নমেন্টের উচিৎ যে, যে সমস্ত স্থান পূর্বে তুর্কী গভর্নমেন্টের অধীনে ছিল এবং এক্ষনে তাহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, সেই সকল স্থান আপনাদিগের অঙ্গীকার মত তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিন। নচেৎ ভারতবর্ষে বিরাট অশান্তি ও বিপদের আশংকা আছে। .... আমি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট এই আশা রাখি যে, তাঁহাদের দ্বারা এমন কার্য হইবেনা, যাহা দ্বারা আমাদিগের ধর্মে আঘাত লাগে এবং আমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ ঘটে। যদি ভূলবশতঃ হইয়াও থাকে তাহা শীঘ্রই সংশোধন করিয়া লইবেন। বর্তমান সময় আমি সাধারণত মোসলমানদিগের নিকট এবং বিশেষতঃ আমার বন্ধু-বান্ধব দিগের নিকট এরূপ আশা রাখি যে, খিলাফত সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য সেই প্রকার কার্য অবলম্বন করিবেন। যাহা দ্বারা রক্তপাত বা শান্তি ভংগের আশঙ্কা না থাকে।"[১২৯]

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভী আব্দুল গফুর সুফী আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ-বাংলা কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগানা জেলায় প্রচারক নিযুক্ত হয়ে ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে কলকাতার খিদিরপুর, মটিয়াবুরুজ এবং হাওড়া জেলায় বহু সভা-সমিতি করেন এবং খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[১৩০]

ড. নজরুল ইসলাম তাঁর "বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক" গ্রন্থে বলেছেন যে, অসহযোগ ভারতের অন্যান্য অংশের মতো বাংলাদেশেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কারণে, হিন্দুরা আন্দোলন করেছিলেন স্বরাজ লাভের আশায় আর মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল খলিফা বা খিলাফত রক্ষা করা।[১৩১]

সর্বভারতীয় খিলাফত নেতা মওলানা শওকত আলী জেলা নেতৃবৃন্দের সাথে খিলাফতের বিশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ১৯২২ সালের মাঝামাঝি কলকাতায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আহ্বান করেন। কারণ তখন খিলাফত আন্দোলন অবসানের দিকে।[১৩২]

তখন মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে নয়া তুর্কী বাহিনী গ্রীক বাহিনীর কবল থেকে স্মার্না উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় সমগ্র মুসলমানরা আনন্দিত হন। কিন্তু তখন মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে তুর্কীরা রাজনৈতিক সেকিউলারিযম গ্রহণ করেছেন। পোষাক-পাতিতে ইউরোপীয় সাজবার চেষ্টা করছেন এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠান বাতিল করতে পারে বলে গুজব রটছে। স্বয়ং তুর্কীরা খিলাফত প্রতিষ্ঠান বাতিল করলে ভারতীয়রা কিরূপে আন্দোলন চালাবেন, প্রধানত এ বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য মওলানা শওকত আলী কলকাতায় এসেছেন। তাঁর মতে কামাল খিলাফত উচ্ছেদ করতে পারেন না। আইনতঃ সে অধিকার তাঁর নেই। খিলাফত কোন দেশ ও রাষ্ট্রের অনুষ্ঠান নয়, এটা বিশ্ব-মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। অতএব, কামাল পাশা এটা উঠিয়ে দিলেও আমরা তা মানবো না। মওলানা শওকত আলীর এ বিস্ময়কর আশাবাদে খিলাফত কর্মীরা নৈরাশ্যের মধ্যে আলোর ছটা দেখতে পেলেন। পরম উৎসাহের মধ্যে খেলাফত কমিটির কাজ শেষ হলো।[১৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

শেষ পর্যন্ত ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ মোস্তফা কামাল আইন করে খিলাফতের বিলোপ সাধন করলে ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলাতেও খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।[১৩৪]

তথ্যসূত্র

১. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ ডিসেম্বর, ১৯১৯

২. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৯

৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ২ নভেম্বর, ১৯১৯

৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ ডিসেম্বর, ১৯১৯, চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস ছিলেন ঢাকা জিন্দাবাহারের জমিদার। তিনি ১৯২১ সালে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করেন। সূত্রঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩

৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩

৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০

৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০

৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০

৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০

১০. *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ মার্চ, ১৯২০

১১. আবুল মনসুর আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩, *ঢাকা প্রকাশ*, ১৩ মার্চ, ১৯২০, *অমৃতবাজার পত্রিকা* (কলকাতা), ৭ মার্চ, ১৯২০

১২. *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ মার্চ, ১৯২০

১৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ মার্চ, ১৯২০

১৪. আবুল মনসুর আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪

১৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ মার্চ, ১৯২০

১৬. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯

১৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ মার্চ, ১৯২০

১৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ মার্চ, ১৯২০

১৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৫ এপ্রিল, ১৯২০

২০. *ঢাকা প্রকাশ*, ৪ জুলাই, ১৯২০

Dhaka University Institutional Repository

২১. Register 1921, Part, II, *op. cit.*, p. 47

২২. *ঢাকা প্রকাশ*, ৮ আগস্ট, ১৯২০

২৩. Chandiprasad Sarkar, *op. cit.*, p. 104

২৪. আবুল মনসুর আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩

২৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭

২৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ ডিসেম্বর, ১৯২০, নওয়াব হাবিবুল্লাহ অক্টোবরের (১৯২০) প্রথম দিকে ঢাকা খিলাফত কমিটির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বৈষয়িক কারণে তাঁর খিলাফত কমিটির সভাপতি থাকা সম্ভব নয়। সৈয়দ আব্দুল হাফিক তার স্থলাভিষিক্ত হন। সূত্রঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭

২৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯২০

২৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ আগস্ট, ১৯২১

২৯. *Register 1922*, *op. cit.*, p. 311

৩০. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ নভেম্বর, ১৯২১

৩১. *Register 1922*, *op. cit.*, p. 61

৩২. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬

৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৩৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ৮ জানুয়ারি, ১৯২২

৩৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭

৩৬. *Register 1922*, Vol. I, *op. cit.*, p. 47

৩৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫০

৩৮. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২

৩৯. আবুল মনসুর আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪

৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯

৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

৪৪. খন্দকার আব্দুর রহিম, *টাঙ্গাইলের ইতিহাস*, পৃ. ৪২৮

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, বাংলাদেশের দশ-দিশারী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬

৪৬. ইব্রাহীম খাঁ, *বাতায়ন*, পৃ. ৪৩৩ (ওয়াজেদ আলী পত্নীর ডাক নাম ছিল চাঁন মিয়া)

৪৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, বাংলাদেশের দশ-দিশারী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭

৪৮. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, কলকাতা, ৪ জুন, ১৯২২

৪৯. Santimoy Ray. *op. cit.*, p. 52

৫০. *Faridpur District Gazetteers*, 1977, p. 45

৫১. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ আগস্ট, ১৯২১

৫২. *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ অক্টোবর, ১৯২০

৫৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২১

৫৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৩ মার্চ, ১৯২১

৫৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪

৫৬. *Register 1922*, *op. cit.*, p. 43

৫৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫

৫৮. *Register 1922*, p. 43

৫৯. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, বাংলাদেশের দশ-দিশারী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৬, সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ১৮২

৬০. ওয়াকিল আহমদ, *মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী* (১৮৭৪-১৯৩৩), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৪-৩১

৬১. S. N. M. Rizvi, M. A. (ed.), *Chittagong District Gazetteers*, 1970, p. 98

৬২. Register 1922, Part I, *op. cit.*, p. 45

৬৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০

৬৪. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯

৬৫. *Register 1922*, *op. cit.*, pp. 45-51

৬৬. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১০

৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

৬৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

৬৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

৭০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

৭১. আবুল মনসুর আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪

৭২. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৬

৭৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

৭৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ জানুয়ারি, ১৯২১

৭৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৩ নভেম্বর, ১৯২১

৭৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ নভেম্বর, ১৯২১

৭৭. *Bangladesh District Gazetteers, Noakhali*, Dacca, 1977, p. 51

৭৮. *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, কুমিল্লা জেলা পরিষদ, ১৯৮৪, পৃ. ১৮৩

৭৯. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২

৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

৮১. কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৩

৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪

৮৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮২

৮৪. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫-১০৬

৮৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩

৮৬. *Bangladesh District Gazetteers, Comilla*, 1977, p. 43

৮৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৮-৮৯

৮৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬-৮৭

৯০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

৯২. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১

৯৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২

৯৪. সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত (সম্পাদিত), *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৫৫ (পরবর্তীতে চরিতাভিধান হিসেবে উল্লেখিত)

Dhaka University Institutional Repository

৯৫. বদিউজ্জামান, *ইসমাইল হোসেন সিরাজী: জীবন ও সাহিত্য*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৭৯

৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২-৮৩

৯৭. Nuru Islam Khan (ed), *Pabna District Gazetteers*, 1978, p. 50

৯৮. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৮

৯৯. K. G. M. Latiful Bari (ed), *District Gazetteers, Bogra*, 1979, p. 39

১০০. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১-১৬২

১০১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪-৫৫

১০২. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৮-১৫৯

১০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯

১০৪. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩

১০৫. নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদিত), *দিনাজপুর জেলার গেজেটীয়ার*, পৃ. ৬৬-৬৭

১০৬. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩

১০৭. আফতাব উদ্দিন চৌধুরী, *অতীতের কথা, দিনাজপুর*, ১৩৭৭ বাং, পৃ. ৩৯

১০৮. নুরুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশের জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর দিনাজপুর*, ঢাকা, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৯১, পৃ. ৬৬-৬৭

১০৯. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০

১১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

১১১. শামছুন নাহার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯

১১২. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৮

১১৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯২১

১১৪. চরিতাভিধান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৭

১১৫. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৭

১১৬. *জেলা গেজেটীয়ার, কুষ্টিয়া*, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪৭

১১৭. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২

১১৮. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

১১৯. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৪

১২০. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫

১২১. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ মার্চ, ১৯২০

১২২. *Register 1922*, p. 21

১২৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৭

১২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮

১২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭-১২৮

১২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮

১২৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬

১২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬-৬৭

১২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৮

১৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

১৩১. আবু আল সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫

১৩২. আবুল মনসুর আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫

১৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

১৩৪. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে তুরস্কের মুসলিম খিলাফতের বিপর্যয়ে ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সৃষ্ট খিলাফত আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয়। যা ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ছিল ধর্মভিত্তিক। খিলাফতকে বিশ্বের মুসলিম সমাজ বিশেষ করে সুন্নী মুসলিম সমাজ মনে করতো ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। আর এর প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে খলিফাকে মনে করতো ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে। তখন মুসলিম খিলাফত ছিল তুরস্কে। সে কারণে সে সময় তুরস্ক ছিল মুসলিম ভারতের ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রাণ কেন্দ্র স্বরূপ।

ভারতের মুসলমানরা তাঁদের রাষ্ট্রীয় গুরু ব্রিটিশের নির্দেশে ধর্মগুরু তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুসলমানদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, তুরস্কের খিলাফত এবং খলিফার মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ তথা মিত্রশক্তি তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ শেষে পরাজিত তুরস্ককে খণ্ড-বিখণ্ড এবং খলিফার অধীনস্থ মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগভাটোয়ারা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যার ফলে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতি ও ধর্ম ভিত্তিক এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়।

ভারতের মুসলমানরা ভাবলেন, তুরস্কের শক্তি ও স্বাধীনতা ছাড়া খিলাফত টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এ উদ্বেগে আবিষ্ট হয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ ভারতে একটি খিলাফত কমিটি গঠন করতে মনস্থ করেন। ভারতের মুসলমানরা ছিলেন ব্রিটিশের প্রজা। তাই তাঁদের জন্য একমাত্র পথ খোলা ছিল – আন্দোলন করে ব্রিটিশ রাজশক্তির নিকট ভারতের মুসলমানদের মনের উদ্বেগ ও আবেগ তুলে ধরা। সে হিসেবে তাঁরা খিলাফত কমিটি গঠন করে খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু মুসলমানদের পক্ষে একা এ আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। কারণ মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু জাতি। তাই হিন্দুদেরও প্রয়োজন ছিল। সে মুহূর্তে হিন্দুরা ভারতে "স্বরাজ" লাভের আশা পোষণ করেছিলেন। তাই হিন্দুরা তাঁদের "স্বরাজ" লাভের জন্য মুসলমানদের পক্ষে হিন্দুদের রাজনৈতিক মুখপাত্র "কংগ্রেস সংগঠন"-এর মাধ্যমে এ আন্দোলনকে সমর্থন করে আন্দোলনে যোগ দেয়। ফলে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র ভারতে একটি গণসংগ্রামে পরিণত হয়। যা ছিল ভারতে প্রথম গণসংগ্রাম। এ আন্দোলন ভারতের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, ধনী-দরিদ্র সকলের মাঝে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। যা পূর্বে কোনদিন হয়নি।

১৭৫৭-৫৮ সালে ভারতে সশস্ত্র সিপাহী বিপ্লব ছিল উপমহাদেশের প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম। যাকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়ে থাকে। এ সংগ্রামের জন্য কোন সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল না। শুধুমাত্র দেশীয় সামরিক বাহিনী ও উঁচুতলার কিছু লোকের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। যা জনসাধারণের মাঝে ততটা ব্যাপকতা লাভ করেনি। কিন্তু খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সকল শ্রেণীর লোকের মাঝেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল মোটামুটি হিন্দুদের হাতে। তবে মুসলমানদের অবদানই ছিল বেশী। যেহেতু আন্দোলনটি শুরু হয় তুরস্ক খিলাফতের বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে। তাই, ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লী অধিবেশনে গান্ধীজির ব্যক্তিগত অসহযোগ কর্মসূচীকে সর্বপ্রথম জোড়ালো সমর্থন দিয়েছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। তাঁর সমর্থনের ফলেই ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ মীরাটে খিলাফতের প্রথম জনসভায় গান্ধীজি তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের স্কীম ব্যাখ্যা করেন। ১৯২০ সালের ১২ মে বোম্বের সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি তাঁর অসহযোগ কর্মসূচী সমর্থন করে। কংগ্রেসের কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে তাঁর কর্মসূচী সমর্থন করা হলেও ডিসেম্বরের ২৬ তারিখে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তা অনুমোদন লাভ করে।

মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ আনসারী, হাকিম আজমল খাঁন, মওলানা আঃ বারী, মওলানা জাফর আলী খাঁন, মওলানা হসরত মোহানী, জনাব মাযহারুল হক, মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা হুসাইন আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

মাদানী, নওয়াব ইসমাইল হোসেন, জনাব মুজিবর রহমান, পীর বাদশা মিয়া, ওয়াজেদ আলী খাঁন পন্নী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা সুলায়মান নাদবী, ড. কিচলু, শেঠ মোহাম্মদ জান ছোটনী, শেঠ ইয়াকুব হাসান, মওলানা বাকী ও কাকী ভ্রাতৃদ্বয়, মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবর্গের ত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম এমনকি কারা বরণের ফলে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

খিলাফত আন্দোলনের অংশ হিসেবে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি, সমাবেশ, হরতাল সহকারে খিলাফত দিবস পালন, মুসলমানরা রোজা ও নামাজ সহকারে তুরস্কের খিলাফত রক্ষা করার জন্য মসজিদে মসজিদে দোয়া প্রার্থনা, আংকারা তহবিলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ সহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন এবং অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে তাঁরা সরকারকে সহযোগিতা বর্জন, সরকার প্রদত্ত খেতাব ও বিভিন্ন পদবী বর্জন, ট্যাক্স প্রদানে বিরত থাকা, বিলেতী দ্রব্য বর্জন করে দেশীয় দ্রব্য বিশেষ করে দেশীয় খদ্দর ব্যবহার, সিভিল সার্ভিস কয়কট, পুলিশ ও সামরিক চাকুরী বর্জন, স্কুল-কলেজ বর্জন ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করে তাঁদের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে মালাবরের বীর জাতি আরব বংশধর মোপলাগনের ত্যাগী অংশগ্রহণ, মাদ্রাজের শেঠ ইয়াকুব হাসানকে গ্রেফতার করে ট্রেন যোগে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার সংবাদে তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য এক ঘন্টার মধ্যে রেলস্টেশনে আগুন জ্বলে উঠা, সিরাজগঞ্জের সলঙ্গার হাটে জনতার উপর পুলিশের গুলিতে বহু মুসলমানের প্রাণহানী, টাঙ্গাইলের ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর গ্রেফতারে ময়মনসিংহ রেল স্টেশনে তাঁকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ইত্যাদি বহু স্মরণীয় ঘটনা তুরস্কের মুসলিম খিলাফতের বিপর্যয়ে ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনের অবসান ঘটে। এ আন্দোলনের অবসানে যতগুলো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. খিলাফত আন্দোলন ছিল মূলত ভারতীয় মুসলমানদের একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। আন্দোলনের ইস্যু ছিল বহির্দেশীয় তুর্কী খলিফার খিলাফত অক্ষুন্ন রাখা। এ আন্দোলনকে একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বাধীনে নিয়ে আসার চেষ্টা সত্ত্বেও এর

Dhaka University Institutional Repository

সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়ে যায়। এ ধরনের একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানের অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতা নেতৃবৃন্দের তেমন ছিল না।

২. প্রায় সকল মুসলিম নেতা খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন দিলেও গান্ধীজির বয়কট কর্মসূচী গ্রহণ করা নিয়ে নেতাদের মাঝে চরম মতভেদ দেখা দেয়। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম নেতৃত্বের অংশটি এ কর্মসূচী গ্রহণের পক্ষে অবস্থান নেয়। অপরদিকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, এ. কে. ফজলুল হক, বর্ধমানের আবুল কাসেম, ঢাকার খিলাফত কমিটির সভাপতি নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ যিনি পরবর্তীতে সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন, হাকিম হাবিবুর রহমান, যাঁর সহযোগিতায় ঢাকার মুসলিম নেতৃবর্গ "মুসলমান শিক্ষা রক্ষা কমিটি" নামক একটি কমিটি গঠন করেন, নওয়াব আলী চৌধুরী, মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী, খাজা মুহম্মদ আজম প্রমুখ এ কর্মসূচীকে "ধ্বংসাত্মক" আখ্যায়িত করে তা মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে হবেনা বিধায় তা গ্রহণে অসম্মতি জানায় এবং আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ায়।

৩. গোরকপুর জেলার চৌরীচৌরার ঘটনার প্রেক্ষিতে বারদৌলিতে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিলে কংগ্রেস তা মেনে নেয় এবং হিন্দুরা এ আন্দোলন থেকে সরে যায়। ফলে মুসলমানদের পক্ষে একা আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। তাই খিলাফত আন্দোলনও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

৪. জরাজীর্ণ তুরস্কের বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী সুলতানের জন্য খিলাফত পুনরুদ্ধারের দাবী ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি অবাস্তব এবং অসঙ্গত দাবী। এছাড়াও মক্কা-মদীনাকে নিজ দেশের অন্তর্ভুক্ত রেখে কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং খিলাফতের ধর্মীয় দায়িত্ব বহনের মানষিকতা তুরস্কের ছিলনা। তাই আরব জাহান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তুরস্ক একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হবার ইচ্ছা পোষণ করতো। অপরদিকে মক্কার শেরীফ-মুহাম্মদ হুসাইন ব্রিটিশদের প্ররোচনায় আরবজাতীয়তাবাদের প্রশ্ন তুলে হেজাজকে তুরস্ক থেকে আলাদা করার ঘোষণা দেন। যে হেজাজ চার'শ বছর ধরে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, শেরীফ হুসাইন

Dhaka University Institutional Repository

তুরস্কের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সেই হেজাজকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করেন। এর বিরুদ্ধে আরব জনগণ কোন জোড়ালো প্রতিবাদ করেনি। এমতাবস্থায় ভারতের মুসলমানদের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন করে নিজেদেরকে উৎসর্গিত করার কতটুকুইবা যুক্তিকতা ছিল। অতএব প্রতিয়মান হয় যে, খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতা খিলাফত প্রশ্নের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। শেষ পর্যন্ত খিলাফতের দাবীর অসারতা উপলব্ধি করে নেতৃবর্গ সরে পড়তে থাকেন। ফলে খিলাফত আন্দোলন নিঃশেষ হয়ে পড়ে।

৫. গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেও খিলাফত প্রশ্নটি রয়েই যায়। কারণ খিলাফত আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয় আন্দোলন। কিন্তু ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী নেতা কামাল পাশা পন্থী সরকার আইন রচনা করে খিলাফত রহিত করেন এবং খলিফাকে সপরিবারে কারারুদ্ধ করেন। যদিও ভারতের মুসলিম নেতৃবর্গ তারযোগে কামাল পাশাকে প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন এবং ভারতীয় মুসলমানদের এক প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য ও অনুরোধ করেন। কিন্তু তুরস্ক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় নেতৃবর্গের এ অনুরোধ রক্ষা করেনি। শুধু তাই নয় নতুন প্রজাতান্ত্রিক তুরস্ক থেকে বলা হলো: "আমরা এতদিন ইসলামী খিলাফতের বোঝা টেনেছি, এখন সেই দায়িত্ব অন্য কোন দেশের পালন করা উচিত। তুরস্ক অন্যান্য দেশের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না।" এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তুরস্কের খিলাফত ছিল সম্পূর্ণরূপে ভারতের জন্য একটি বৈদেশিক ব্যাপার। এখানে ধর্মীয় প্রেরণার উৎস থাকলেও ভারতের মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীর অন্যকোন দেশের মুসলমানরা তুরস্কের খিলাফতের বিপর্যয়ে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। সে হিসেবে ভারতের মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ খিলাফত আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকিপূর্ণ। তাই আন্দোলনটির যবনিকাপাত ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

এর পরও তুরস্কের খিলাফতের বিপর্যয়ে ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ার সুদুর প্রসারী ইতিবাচক ফলাফল বহন করে ছিল। তাঁদের প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে ভারতে তথা বাংলায় যে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়, তা ভারতের রাজনৈতিক আকাশকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। তা হলো:

১. খিলাফতের প্রতি ভারতের মুসলমানদের যে ধর্মীয় আসক্তি তা ছিল মূলতঃ তাঁদের মধ্যে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ। যা নিঃসন্দেহে ধর্মীয় আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ। এ চেতনাবোধ ভারতের মুসলমানদের ন্যায় বহির্বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে যদি উদ্ভুত হতো তা হলে মুসলমানদের অতীত রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি, মুসলিম ঐক্য এবং বৈষম্যহীন, সুষ্ঠু ও উন্নত সামাজিক নীতির ঐতিহ্য পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করতো। তাই ভারত ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য মুসলমানরা খিলাফতের বিপর্যয়ে তেমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করলেও ভারতের মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বে মুসলিম ভাতৃত্ববোধে ক্ষানিকটা হলেও অবদান রেখেছে এবং মুসলমানদের ধর্মীয় রাজনৈতিক ঐক্য, বৈষম্যহীন, সুষ্ঠু ও উন্নত সামাজিক রীতি-নীতির ঐতিহ্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

২. খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে ভারতে হিন্দু-মুসলমানদেরকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে, যা ইতিপূর্বে কখনো সম্ভব হয়নি। এ ঐক্যের জন্য তাঁরা স্বরাজের দাবীতে সারা ভারতে আন্দোলনের ঝড় তুলে। এতে ব্রিটিশ সরকারের ভীতকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল।

৩. খিলাফতের বিপর্যয়ে এ অঞ্চলের মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ভারতবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ অংকুরিত হয়, যা ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রভাবিত হতে থাকে। ফলে স্বাধীনতার যে প্রবল জোয়ার উদগত হয়, তাতে আর ভাটা পড়েনি। যা হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য-অনৈক্য ও ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলে। যেহেতু মুসলমানরাই স্বাধীনতা শব্দটি প্রথম উচ্চারণ করেন। যদিও হিন্দুরা প্রথম স্বাধীনতার দাবী না তুলে স্বরাজের দাবী তুলে। ১৯২১ সালের আহমেদাবাদের কংগ্রেস অধিবেশনে মুসলিম নেতা মওলানা হযরত আলী সৎসাহস কিংবা দুঃসাহস

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর কথা উত্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলে ফেললেন, "The demand has grieved me because it shows lack of responsibility". অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানরাই প্রথম স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেন।

৪. গান্ধীজির রাজনৈতিক উন্নতির মূলে ছিল মুসলমানদের উদার আগ্রহ। তাঁরাই তাঁকে খিলাফত কমিটির নেতা করে "মহাত্মা" উপাধি দিয়ে সারা ভারতে তাঁকে উচুঁমানের রাজনৈতিক নেতারূপে প্রদর্শিত করেন। যার সুত্রপাত ধরে গান্ধীজি ভারতবর্ষে এক পর্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে পরিগণিত হন।

৫. খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন ভারতবাসীদের রাজনৈতিক চেতনাবোধ আরোও জাগ্রত করে। তাঁদের মন থেকে ধরপাকড়, নির্যাতন, জেলজুলুম ইত্যাদির ভয়ভীতি দূর হয়। এ অহিংস আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীরা যতই নির্যাতন ভোগ করেছে ততই তাঁদের সাহসিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরা যে ভীরু কাপুরুষ নয় তা ভারত তথা বাংলার বিভিন্ন এলাকার রাস্তায় রাস্তায় শত শত বার প্রমান করেছে। আন্দোলনকারীরা নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে থেকে পুলিশের মার খেয়েছে কিন্তু আত্মরক্ষার চেষ্টা করেনি। শুধু তাই নয় শিশুরাও চুপি চুপি জেলে ঢুকে পড়েছে। তাদেরকে বের করে দিলে ক্রন্দন করতো। জনগণের মাঝে ব্রিটিশ বিরোধী অসন্তোষ ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে উঠে। আন্দোলনের অবসান ঘটলেও তাঁদের দুঃসাহসিকতা অটুট থাকে এবং এ দুঃসাহসিকতা নিয়েই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতার পথ সুগম করে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শক্তির অবসান ঘটিয়ে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে।

৬. খিলাফত-অসযোগ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বহু জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত স্থাপিত হয়। বিদেশী ভাবধারার অনুকরণ ছেড়ে নিজস্ব ভাবধারায় শিক্ষা গ্রহণ করে।

৭. খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে তাঁরা বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করতে থাকে। তাতে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটে। ফলে দেশীয় অর্থ

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশে পাচারের সুযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। জনগণের মাঝে দেশ প্রেম বোধ জাগ্রত হয়। জাতীয় চেতনায় জাগ্রত হয়ে আত্মগৌরব উপলব্ধি করে। বিলেতী পোষাক বর্জনের ফলে দেশীয় পোষাকের কদর বৃদ্ধি পায়।

৮. কোর্ট-কাছারি বর্জনের ফলে দেশীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কোর্ট স্থাপিত হয়। এতে সামাজিক ন্যায়বিচার ও শান্তি-শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়।

৯. বিশ শতকে মুসলিম স্বতন্ত্রবাদী আন্দোলন জোড়দার হয়ে পরবর্তীতে পাকিস্তান সৃষ্টির পথ সুগম ও সহায়ক হয়েছিল। বস্তুতঃ এর পটভূমি রচিত হয়েছিল বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে খিলাফত আন্দোলন ছিল এ সকল আন্দোলনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

অতএব, তুরস্কের মুসলিম খিলাফতের বিপর্যয়ে ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া সাময়িক সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে বন্ধ হয়ে গেলেও ঐ সাময়িক সময়ের মূল্যবোধ ধ্বংস হয়নি। ঐ মূল্যবোধ এবং তাঁদের সঞ্চিত সংগ্রামী চেতনাবোধই শেষ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীন সার্বভৌম তথা বাংলাদেশকেও স্বাধীন সার্বভৌম আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের এ প্রতিক্রিয়াকে ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য স্থানে স্থান না দেয়ার কোন উপায় নেই।